ভারতের
কৃষক বিদ্রোহ

(১৮৫০—১৯০০)

এল. নটরাজন্

অনুবাদ : পীযুষ দাশগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৩

চৌদ্দ আনা

প্রকাশক :
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং
২৮, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশই বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণ ও ব্যর্থ অনুসরণে মেতে উঠেছিল, সাম্রাজ্যবাদের সিভিল সার্ভিসে কয়েক কুড়ি চাকুরীর আবেদন-নিবেদনের আন্দোলনের মধ্যেই আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল, তখন ভারতের এই কৃষক সমাজই বিদেশী শাসক আর তার দেশী সাঙ্গ-পাঙ্গদের—জমিদার ও মহাজনদের—কায়েমী কর্তৃত্বের দুর্গপ্রাচীরে আঘাতের পর আঘাত হেনে চলছিল।

বৃটিশের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহের পরে উনিশ শতকের প্রথম অর্ধের শেষাশেষি টিপু সুলতান, মারাঠী শক্তিবর্গ, রঞ্জিৎ সিং এবং ভারতের অপরাপর শাসকবৃন্দ একে একে অস্ত্র পরিত্যাগ করেন। কক্ষচ্যুত সামন্ত নৃপতিদের ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনীগুলি থেকে উদ্ভূত এবং দেশজোড়া ধূমায়িত গণ-বিক্ষোভের সমর্থনে লালিত পিণ্ডারী, ঠগী ও ডাকাতরাও ইতিমধ্যে দমিত হয়। বিজয়-উল্লাসে উল্লসিত ইংরেজ ভারতের নতুন নতুন অঞ্চলে এবার তাদের ক্ষমতা বিস্তারে মত্ত হয়ে উঠল। ভারতের রঙ্গমঞ্চে এতদিন পর্যন্ত সামন্ত নৃপতি, দলপতি আর তাদের সৈন্য-সেপাইরাই জেঁকে ছিল; এবার তারা স্থানচ্যুত হল। ১৮৫০ সালের নাগাদ ভারতের বুকে বৃটিশ আধিপত্য অবধারিত ঘটনা হিসেবেই প্রতীয়মান হল। বিদেশী শাসকেরা এই বলে আত্ম-প্রসাদ লাভ করল যে ভারতের লোকেরা ভাল হলে শান্ত-শিষ্ট, গোবেচারা, আর খারাপ হলে চপলমতি, কাপুরুষ। ভারত তো এখন তাদেরই! আর কি? এখন রাজ্যপাট গুছিয়ে, রেললাইন বিছিয়ে পরিপাটি হয়ে বসলেই হল; তারপর শুরু হবে গ্রামাঞ্চল জুড়ে অর্থনৈতিক নাগপাশ ছড়িয়ে দিয়ে অবাধে মুনাফা কামাবার নির্ঝঞ্ঝাট পালা।

ইতিমধ্যে ভারতীয় সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদেও আমূল রূপান্তর ঘটছিল। বৃটিশ ভূমিব্যবস্থা, উঁচু হারে রাজস্ব ও

জনস্বার্থ-বিরোধী বিচারপদ্ধতির দৌলতে জমিদার আর মহাজন-ভূস্বামীরা কৃষকসমাজের উপর তাদের কব্জা আরও বিস্তার করতে সক্ষম হল। বিলাত থেকে আমদানী, কলের তৈরি শস্তা মালে ভারতের শহর-গ্রাম ভেসে গেল, ভারতের কুটীর শিল্পের সর্বনাশ হল; কুটীর-শিল্পীরা পেশা হারিয়ে দরিদ্র কৃষকসমাজের জনসংখ্যা আরও বাড়িয়ে তুলল।

ভারতে আবির্ভাব হল নতুন নতুন শ্রেণীর: একদিকে জমিদার ও মহাজন-ভূস্বামীরা আর অন্যদিকে ভূমিহারা কৃষকসমষ্টি ও বৃত্তিহারা কুটীর-শিল্পীরা—তারা বাধ্য হল স্বত্বহীন চাষী, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুর হিসেবে জীবিকা অর্জন করতে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হল এক নতুন অবস্থা। এই নতুন অবস্থায় জমিদার, মহাজন-ভূস্বামী ও বৃটিশ সরকার—জনগণের এই উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে যে-গণসংগ্রাম তার চরিত্রেরও ঘটল আমূল পরিবর্তন; নতুন অবস্থা অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন স্বভাবতই দেখা দিল।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। কিন্তু দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় সেই বিদ্রোহের লক্ষ্য, পথ ও নেতৃত্ব সবই যুগের অনুপযোগী বলে প্রতিপন্ন হল। তাই জীবন্ত সংগ্রামে তারা হল প্রত্যাখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত হল অতীতের যাদুঘরে। প্রয়োজন দেখা দিল অতীতের হিসেব-নিকেশের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের নিশানা স্থির করে বর্তমানের কর্মপন্থা নির্ধারণের। জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী হাজির করতে হবে নতুন দাবি, তুলতে হবে নতুন আওয়াজ। চাই নতুন পথের নতুন পাঁচালী, নতুন দিনের নতুন নেতৃত্ব।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। কৃষক বিদ্রোহের ঢেউয়ের পরে ঢেউ সারা দেশকে করে তুলল উদ্বেল, উত্তাল। এই যৌবন-জলতরঙ্গ

প্রথম ভেঙে পড়ল সাঁওতাল বিদ্রোহের আকারে—১৮৫৬-৫৭ সালে। সাঁওতাল বিদ্রোহের তরঙ্গ নির্ঘোষ যেন সারা দেশ জুড়ে কৃষক-অভ্যুত্থানের তূর্য নিনাদ—প্রকাশ্য আহ্বান। কৃষক-বিক্ষোভ ফেটে পড়ল এখানে সেখানে—হাজার হাজার এলাকায়। শুরু হল নতুন ধরনের সংগ্রামের নতুন এক যুগ—ব্যাপক ভিত্তিতে সত্যিকারের গণ-সংগ্রামের যুগ। বিদ্রোহী সাঁওতালদের মাদলের আওয়াজ এই নতুন যুগের আবহ সঙ্গীত।

অগণিত এই কৃষক সংগ্রামের মাত্র কয়েকটির কথাই এখানে স্মরণ করি।

স্মরণ করি পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল কৃষক-যোদ্ধার প্রতিজ্ঞাদৃপ্ত অভিযানের কথা—যাদের প্রায় পঁচিশ হাজার যোদ্ধাই শহীদ হয়েছিলেন জমিদার, মহাজন আর বিদেশী সরকারের ত্রিমূর্তি শয়তানের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে। স্মরণ করি বাংলার নীলচাষীদের কথা, সেই ১৮৬০ সালে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যাঁরা চালিয়েছিলেন সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত সাধারণ ধর্মঘট। স্মরণ করি আমেদাবাদ আর পুণার মারাঠী কৃষকদের—১৮৭৫-৭৬ সালে শাসকশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে যাঁরা মহাজনদের নথিপত্র দখল ও দগ্ধ করে সৃষ্টি করে গিয়েছেন ১৯২০-৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বিলাতী পণ্য দাহনের প্রথম প্রেরণা।……… সংগ্রামী কৃষক! নির্ভীক কৃষক! তোমাকে স্মরণ করি, সালাম জানাই!

স্মরণ করি মোপলা কৃষকদের অজস্র বিদ্রোহের অদম্য বীরত্ব কাহিনী। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের ঠিকেদারেরা ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত করলেও আমরা ভুলিনি ১৮৩৬ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত জমিদার আর সরকারের উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে তাঁরাই উড্ডীন রেখেছিলেন সংগ্রামী প্রতিবাদের পবিত্র পতাকা। স্মরণ করি বাংলা-

দেশের পাবনা ও বগুড়ার অকুতোভয় কৃষক-যোদ্ধাদের, মিথ্যা ও বিকৃতির বেসাতি সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস পর্যন্ত যাঁদের অভ্যুত্থানকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। "সমগ্র বাংলাদেশকেই এই অভ্যুত্থান প্রকম্পিত করে তুলেছিল"—এই উক্তি কেম্‌ব্রিজ ইতিহাসেরই অনিচ্ছাকৃত জবানবন্দী।… ‥সংগ্রামী কৃষক! নির্ভীক কৃষক! আবার তোমাকে স্মরণ করি, সালাম জানাই।

কোন কোন পুঁথিপত্রবাহী পণ্ডিতপ্রবর কৃষককে অভিহিত করেছেন "ইতিহাসের ভারবাহী জানোয়ার" বলে। হ্যাঁ, কৃষকেরা ভারবাহীই বটে; যুগে যুগে সংগ্রামের ভার, সভ্যতার ভার বয়ে এসেছেন তাঁরাই। পথ নির্দেশের উপযুক্ত কোন রাজনৈতিক দর্শন তাঁদের ছিল না, একটানা সংগ্রাম পরিচালনার উপযুক্ত কোন সংগঠন তাঁদের ছিল না;—কিন্তু তবুও এই কৃষকেরাই যুগের পর যুগ বিরতি-বিহীন সংগ্রামের মৃত্যুহীন ঐতিহ্য সৃষ্টি করে এসেছেন। নিজের বুকের রক্ত আর চোখের জলে এরাই মাটিকে তৈরি করে রেখেছিল পরবর্তী যুগের—বিংশ শতাব্দীর—বিশাল গণআন্দোলনের ফসল ফলাবার জন্য।

ইতস্তত সংঘটিত স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাই পরিণতি লাভ করে উত্তাল বন্যাস্রোতের উদ্দাম আবেগে—ভাসিয়ে নিয়ে যায় অত্যাচারী শাসনশক্তির গুরুভার পাষাণকে লঘুভার তৃণের মত।

পাশবিক নিষ্পেষণে কৃষক সংগ্রামের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু সংগ্রামী কৃষককে হত্যা করা গেলেও কৃষক সংগ্রামকে তো হত্যা করা যায় না; তাই পুঞ্জীভূত অত্যাচারের জগদ্দল পাষাণও কখনও পারেনি এই সংগ্রাম-প্রবাহকে একেবারে রুদ্ধ করে দিতে। যদি কখন এই সংগ্রামে স্তব্ধতা দেখা

দিয়ে থাকে, তবে সে স্তব্ধতা আসন্ন ঝড়েরই পূর্বাভাস। এই স্তব্ধতা বুক ভরে শ্বাস নেবার জন্য, নতুন সংগ্রামের মহড়ার জন্য সাময়িক স্তব্ধতা। এ স্তব্ধতা অগ্নিগর্ভ !…………

হ্যাঁ, এই হল ভারতের কৃষক সমাজের সুমহান্ উত্তরাধিকার।……

কিন্তু হায়! "বিকৃত ইতিহাসের" ফেরিওয়ালা ঐতিহাসিকদের মোটা মোটা কেতাবের গহন অরণ্য পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে দেখুন, কৃষক সংগ্রামের এই গৌরবময় মহাকাব্যের অস্পষ্ট রূপরেখাও আপনার চোখে পড়বেনা। এক দিকে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী ইতিহাস-ব্যবসায়ীরা ;—লাটবেলাট আর ইংরেজ পুঙ্গবদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাপের চটকদার বর্ণনায় তাদের সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োজিত। অন্য দিকে ভারতের ইতিহাস-অভিমানীরা ;—রামমোহন, রানাডে, দয়ানন্দ প্রমুখ সংস্কারকদের প্রশস্তি রচনাতেই তাঁদের সৃজনী ক্ষমতা নিঃশেষিত। তাই, কি বিদেশী, আর কি স্বদেশী—কোন ইতিবৃত্তেই এই মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামশীল মানুষগুলির জন্য এতটুকু জায়গা সসম্ভ্রমে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

কখনও কখনও অবশ্য প্রবল গণসংগ্রামের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এই ঐতিহাসিক নীরবতার কুটিল চক্রান্তকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু তখনও ঠুলিবাঁধা এই ঐতিহাসিকেরা এই মহান্ গণঅভ্যুত্থানকে "দাঙ্গা হাঙ্গামা" বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের চোখে কৃষকদের অভ্যুত্থান হল "নিরক্ষর কৃষকদের হিংস্র ও বর্বর ক্রিয়াকাণ্ডের তাণ্ডব লীলা"। অথচ গৌরবময় এই কৃষক সংগ্রামকে দমন করবার জন্য পাশবিক নিষ্পেষণের যে আরণ্য রাজত্ব সরকার সৃষ্টি করে, তা হল এই ঐতিহাসিকদের মতে "দুর্বৃত্তদমনে, আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপনে এবং প্রগতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে" বিদেশীদের অতুলনীয় অবদান! ………আর "বিকৃত ইতিহাসের" এই বিষাক্ত বটিকাই "ভারতের

ইতিহাস” ব’লে দিনের পর দিন আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের গেলানো হচ্ছে!

এই যখন অবস্থা, তখন মিথ্যা ও অর্ধসত্যের আবর্জনা সরিয়ে ফেলে সত্যিকারের তথ্যাদি উদ্ধার করা এক অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), নীলচাষীদের ধর্মঘট (১৮৬০) এবং মারাঠী কৃষকদের অভ্যুত্থান (১৮৭৫-৭৬) সম্পর্কে মালমশলা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। কিন্তু মোপলা কৃষকদের সংগ্রাম (১৮৩৬-৯৬) এবং পাবনা ও বগুড়ার বাঙ্গালী কৃষকদের অভ্যুত্থান (১৮৭২) সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যাবলী একান্তই অপ্রচুর। এছাড়া এমন অনেক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে, যার ঠিকানাই কেবল আমরা পেয়েছি, তার বেশি কিছু পাইনি।

বিকৃত ইতিহাসের অন্তরালবর্তী বিস্মৃত তথ্যসম্ভারের পুনরুদ্ধার করে ধারাবাহিক এক ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজন আরও অনেক গবেষণা ও পর্যালোচনা; প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী পাণ্ডুলিপি, নথিপত্র, লোকগীতি, লোককথা, সমসাময়িক সাহিত্যের সমষ্টিগত অনুশীলন ও অনুধাবন। গোপন দলিলপত্রাদির অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ ছাড়া এ প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ ও অসার্থক হতে বাধ্য। বিলম্বে হলেও অন্তত এখন সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হবেন এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় মহাফেজখানার গুপ্তকক্ষের দ্বার সন্ধানী পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন, এ আশা কি দুরাশা?

ক্ষুদ্র এই বইখানিকে উনিশ শতকের কৃষক সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলে দাবি করবার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। গণআন্দোলনের পুরোগামীদের সঙ্গে অনুগামীদের পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে এ এক প্রাথমিক প্রচেষ্টা। আশা রইল গণআন্দোলনের বর্তমান পতাকা-বাহীরা তাঁদের সংগ্রামী পূর্বপুরুষদের বিস্তারিত ইতিহাস, রচনা করে এই প্রচেষ্টাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষক অভ্যুত্থানের পটভূমিকা

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে নিদারুণ দুর্দশা ও ভিক্ষাবৃত্তি সৃষ্টি করেছে, বাংলার ভূসম্পত্তিতে যে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত করেছে, বোধহয় কেবল মাত্র আইন-প্রণয়নের মারফত আর কোনও দেশে, আর কোনও যুগে এত অল্প সময়ের মধ্যে তা সম্ভব হয়নি।

—পঞ্চম রিপোর্ট, হাউস অব লর্ডস (১৮১২)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পরে মাত্র কুড়িটি বছর যেতে না যেতেই ১৮১২ সালে লর্ড সভার পঞ্চম রিপোর্টে উক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে এই নিদারুণ ধিক্কারবাণী উচ্চারিত হয়। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবে যারা এর প্রসাদপুষ্ট হয়েছে তারা ছাড়া আর সকলেই তীব্রভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করে এসেছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও দেড়শো বছরেরও বেশি দিন পরে আজও পর্যন্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পূর্ব মাদ্রাজ এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের কৃষকেরা এই ব্যবস্থার জগদ্দল পাষাণের চাপে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। কৃষক সমাজের তীব্রতম রোষের লক্ষ্যস্থল এই জমিদারেরা; তাই ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণগুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা দরকার; অথচ তা এতদিন পর্যন্ত হয়নি।

ডাঃ ভেরা এ্যান্স্টে এই নিয়ে কিছু মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু তথ্য পরিবেশন ও বিশ্লেষণ অপেক্ষা তথ্যের বিকৃতি সাধনেই তাঁর আগ্রহ বেশি। তাঁর মতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসকদের নিছক অজ্ঞতার ফলেই এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার উদ্ভব। বেচারী সাহেবদের কাছে ভারত এক সম্পূর্ণ নতুন দেশ। বিদেশে-বিভূঁয়ে এসে এখানকার জটিল ভূমিব্যবস্থার গোলকধাঁধাঁর রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পেরে নেহাৎ নিরুপায় হয়েই এই ব্যবস্থা তাঁরা চালু করেন। তিনি লিখেছেন:

"কোম্পানীর চাকুরেদের কাছে প্রথম দিকে ভারতের জটিল কাঠামো ছিল একেবারেই অজ্ঞাত। তাঁরা তখন 'জমিদারকে খোঁজ করতে' লেগে গেলেন।.........পরে অবশ্য আবিষ্কার হল যে অধিকাংশ 'জমিদার' আগে কোন দিনই জমির মালিক ছিলেন না।.........কিন্তু ইংরেজরা ভূস্বামী বলতে যাঁদের বুঝে থাকেন, গোড়ার দিকে এই 'জমিদারদের' তাঁরা সেই ধরনের ভূস্বামী বলেই ভুল করে বসেন।" (১)

বিকৃত ইতিহাসের এ হল এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। সাম্রাজ্যবাদের এই দোঁহারদের তীব্র আক্রমণ করে মার্কস এঁদের সম্পর্কে ঠিকই মন্তব্য করেছেন, "ভাবের উত্তাপে তপ্ত মস্তিষ্কে তথ্যাদি গুলিয়ে ফেলা সম্ভব ; কিন্তু তথ্য যখন বিকৃত করা হয় তখন তা ঠাণ্ডা মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া।" (২)

ভারতে জমিদারেরা জমির মালিক নয়—এই তথ্য সম্পর্কে কোম্পানীর সাহেবরা যে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তার সাক্ষ্য হিসাবে প্রমাণের পর প্রমাণ হাজির করা যায়। ১৭৭৩ সালে পাটনার কাউন্সিল রাজস্ব-সংগ্রহের সুবিধার জন্য জমিদারদেরই জমির মালিক বলে ঘোষণা করবার জন্য এক সুপারিশ করে। কিন্তু 'বোর্ড অব রেভিনিউ' সঙ্গে সঙ্গেই এই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে। বোর্ডের মতে এই ধরনের ব্যবস্থা 'এত বিপজ্জনক' যে পরীক্ষা করে দেখার ঝুঁকিও নেওয়া চলে না। (৩)

এণ্ডার্সন, বোগ্‌ল্ এবং ক্রফটস—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যোগ্যতম কর্মচারীদের মধ্য থেকে এই তিনজনকে নিয়ে ১৭৭৬ সালে একটি

১। ভেরা অ্যান্‌স্টে. ইকনমিক ডেভোলপমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৯৮।

২। কার্ল মার্কস, মার্কস অন চায়না, (লণ্ডন, ১৯৫১) পৃঃ ৭৮।

৩। দি কেমব্রিজ হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়া (কেমব্রিজ, ১৯২৯) পৃঃ ৪১৯।

কমিশন নিয়োগ করা হয়—সমগ্র ব্যাপারটি তদন্ত করবার উদ্দেশ্যে। ১৭৭৮ সালের ২৮শে মার্চ এই কমিশন তার তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করে। কেমব্রিজ ইতিহাসে এই রিপোর্টকে আখ্যাত করা হয়েছে "কোম্পানীর আমলে বাংলার প্রথম যুগের রাজস্ব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দলিল" বলে। ফার্সী, বাংলা ও ওড়িয়া দলিলপত্র এবং বিস্তারিত আঞ্চলিক তদন্তকার্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্টে তর্কাতীতভাবে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে জমির মালিকানা হল কৃষকদের; জমিদার কেবলমাত্র রাজস্ব-সংগ্রাহক। কেমব্রিজ ইতিহাসের মতে জেমস গ্র্যাণ্ট ছিলেন "একজন বিশেষজ্ঞ, রাজস্বব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক অধ্যয়নের জন্য তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ; সেরেস্তাদার হিসাবে রাজস্ব-সংক্রান্ত নথিপত্র অনুধ্যানের অপূর্ব সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন" (৪);—এই জেমস গ্র্যাণ্টও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে কৃষকরাই জমির মালিক, জমিদার নয়। রাজস্ব ব্যাপারে লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তিনি ঘোষণা করেন, জমিদাররা জমির মালিক। —এই অভিমত

> "স্পষ্টতই এত আজগুবি, নীতিগতভাবে এত ভ্রান্ত যে আত্মপক্ষ খণ্ডন না করে, ভিত্তি ও সিদ্ধান্ত—উভয়েরই শূন্যগর্ভতা না দেখিয়ে অন্য কোনও ভাবে বা ভঙ্গীতে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। হিন্দুস্থানের মানুষদের পক্ষ থেকে বলা যায় যে, এ হবে এক অত্যন্ত **বিপজ্জনক উদ্ভাবন**—প্রাচ্যজগতের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত রকমের আইনের ঠিক বিপরীত, আক্ষরিক ও ভাবগত উভয় দিক থেকেই। (৫)

৪। ঐ পৃঃ ৪২৫, ৪৩২, ৪৩৫।

৫। ব্রীগস্ কর্তৃক উধৃত, ল্যাণ্ড ট্যাক্স ইন ইণ্ডিয়া; পৃঃ ১৬৩-৪।

জমিদাররা যে জমির মালিক নয়, শুধুমাত্র রাজস্ব-সংগ্রাহক—এই সত্য প্রমাণ করবার জন্য আরও অনেক তথ্য-প্রমাণ হাজির করা যায়। (৬)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেশ কিছুসংখ্যক কর্মচারীর এই কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে পূর্ব-ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা বেশ ভালভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। এইসব অভিজ্ঞ কর্মচারীর তদন্তের ফলাফল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ষোল আনা বিপক্ষে যায়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার কোন্ কোন্ ঘটনার সমাবেশে লর্ড কর্নওয়ালিসকে ভারতে পাঠানো হয়। বৃটেনের আমেরিকান উপনিবেশ গুলির অন্তর্বর্তী ইয়র্কটাউনে কর্নওয়ালিসের চরম পরাজয়ের পরে আমেরিকানরা চূড়ান্ত ভাবে বৃটিশের হাত থেকে তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়। ফরাসী বিপ্লবের যুগান্তকারী ভাবধারা সমগ্র ইউরোপকে উত্তাল করে তোলে। বাংলাদেশে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়।

৬। তথ্য প্রমাণের আংশিক তালিকা :—

(ক) জে, মিল, হিস্ট্রী অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া (৫ম সংস্করণ) পৃঃ ২৪, ৩৯২।

(খ) এইচ বিভারিজ : এ কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়া ; পৃঃ ৩৭৮।

(গ) এ, ডি, ক্যাম্পবেল : ল্যাণ্ড রেভিনিউ অব ইণ্ডিয়া ; সিলেক্ট কমিটির অনুরোধ-ক্রমে ১৮৩২ সালে প্রস্তুত, রিপোর্টের তৃতীয় খণ্ডের ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট।

(ঘ) হাউস অব কমন্স, 'মিনিট্স্ অব এভিডেন্স, রেভিনিউ, ১৮৩২' ; ডেভিড হিলের কাছে প্রশ্ন নং ১৩৩৩ এবং প্রশ্ন নং ২৩০৬।

(ঙ) হাউস অব লর্ডস্, 'মিনিটস অব এভিডেন্স', সিলেক্ট কমিটি ১৮৩০, আর রিচার্ডস্-এর কাছে প্রশ্ন নং ৩৯৬১।

(চ) আর, বি, র‍্যামসবোথাম, ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিস্ট্রী অব বেঙ্গল : ১৭৬৯—১৭৮৭ (১৯২৬), এণ্ডার্সন, বোগ্ল্ এবং ক্রফ্ট্স্-এর রিপোর্ট (২৭শে মার্চ, ১৭৭৮)।

১৭৭২ সালে রংপুরের মত বৃহৎ এক জেলায় "পঞ্চাশ হাজার মানুষ বাংলার ধানের ক্ষেতে নেমে আসে" গর্জায়মান বন্যাধারার মত। তাদের দমন করবার জন্য চার চারটি ব্যাটালিয়নকে ঘটনাস্থলে পাঠাতে হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে ক্যাপ্টেন টমাস নামে এক সেনানায়ককে কৃষকরা কেটে ফেলে। সরকার এই কৃষকদের উপর দণ্ড দান করে নির্বিচারে—প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারীকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড আর তার পরিবার পরিজনকে আজীবন ক্রীতদাসত্ব। কিন্তু এত করেও তাদের দমন করা গেল না। ১৭৮০ সালে কলকাতায় তারা এক অগ্নিকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে ;—তার ফলে ভস্মীভূত হয় পনেরো হাজার ঘরবাড়ী। কিছুদিন পরে ১৭৮৩ সালে তিন হাজার কৃষকের এক বাহিনী যশোর জেলায় সরকারের রাজস্ববাহী এক কর্মচারীকে আক্রমণ করে সমস্ত টাকাপয়সা করায়ত্ত করে। উক্ত জেলাতেই ১৫০০ কৃষকের আর একটি বাহিনীর হাতে সরকারী সেপাইরা পর্যুদস্ত হয় ; এই সেপাইরা গিয়েছিল তাদের নেতাকে গ্রেপ্তার করতে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলের ঠিক আগেই বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৭৭৮ সালে ১০০০ কৃষকের এক বাহিনী বিষ্ণুপুর শহরকে বিপর্যস্ত করে দেয় ; কয়েক বছর পরে এই শহরকে তারা আবার আক্রমণ করে এবং অধিকার করে। (৭)

ধূমায়িত বিক্ষোভের এই পটভূমিকাতেই ভারতের বড়লাট হিসাবে লর্ড কর্নওয়ালিসের নিয়োগের ব্যাপারটিকে দেখতে হবে। লর্ড কর্নওয়ালিসের নিয়োগকে অভিনন্দন জানিয়ে হেনরী ডাণ্ডাস (পরে ইনিই সর্বপ্রথম লণ্ডনস্থ 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল'-এর সভাপতি হন)

৭। হীরেন মুখার্জী, ইণ্ডিয়া ষ্ট্রাগল্‌স্‌ ফর ফ্রীডম, পৃ ৩৯-৪০, এল, এস, এস, ওম্যালি। বেঙ্গল, বিহার এ্যাণ্ড উড়িষ্যা আণ্ডার বৃটিশ রুল (কলিকাতা, ১৯২৫) পৃঃ ২০৮, ২৩৭, ২৮৭, ৩০৩-৮ ; হাণ্টার, এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল।

পার্লামেণ্ট ভবনে যে প্রশস্তি গেয়েছিলেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তিনি বলেছিলেন—

"লর্ড কর্নওয়ালিস অভিজাত, বিত্তবান এবং নিষ্কলঙ্ক খ্যাতির অধিকারী।.........এই ব্যক্তিটির গুণাবলীর উপরেই গত মন্ত্রীসভা **এশিয়ায় আমাদের মুমূর্ষু স্বার্থ জীইয়ে তোলার সমস্ত আশা ভরসা ন্যস্ত করেছিলেন**—এবং করেছিলেন সঠিক ভাবেই।" (৮)

কর্নওয়ালিসের "মহান্ ব্রত" ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের এক ব্যাপক সামাজিক বনিয়াদ রচনা করা। তাঁর এই ব্রত সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং এমন নির্লজ্জভাবে এই ব্রত তিনি পালন করেছিলেন যে পরবর্তী যুগে সাম্রাজ্যবাদের স্তাবকদের পর্যন্ত তাঁর সমর্থনে দাঁড়াতে লজ্জা পেতে হয়েছে। ১৭৮৯ সালের ২রা আগস্ট তারিখে 'পরিচালক পরিষদের' কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি প্রস্তাব করেন ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য চালু রাখবার জন্য জনগণের মধ্যে 'স্তর-বিভাগ' প্রবর্তন করার প্রয়োজন। তিনি আরও সুপারিশ করেন যে বেশ বড় সংখ্যক জমিদার ও ব্যবসায়ীর জন্য সুবিধাজনক এক বন্দোবস্তের সূত্রপাত করা দরকার। তিনি লিখলেন—

"অন্যান্য সমস্ত বিবেচনা ছেড়ে দিলেও নিছক কেবল কোম্পানীর স্থূল স্বার্থকে পুষ্ট করবার জন্যেই দারুণভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রধান প্রধান জমিদার ও ব্যবসায়ীকে এমন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা যাতে করে তাঁরা তাঁদের পরিবার পরিজনের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন ; জরুরী হয়ে পড়েছে একটা **রীতিমত স্তরভেদ প্রবর্তনের ;** শৃঙ্খলা

৮। দি কেমব্রিজ হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।

রক্ষার জন্য এই স্তরভেদ প্রবর্তনের এখানে যেমন প্রয়োজন তেমন আর কোথায়ও নয়।" (৯)

বিশেষ ভাবে জমিদারী অধিকারাদি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৭৮৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের একটি ইস্তাহারে একান্ত নির্লজ্জভাবে তিনি লেখেন,

"জমিদাররাই জমির স্বত্বাধিকারী, এ তথ্য সম্পূর্ণ তর্কাতীত—এ বিষয়ে আমি ষোল আনা কৃতনিশ্চয় হয়েছি।......আমি আর একটি বিষয়েও কৃতনিশ্চয় হয়েছি, তা' হল এই যে জমির স্বত্বাধিকার যদি তাদের না-ও থেকে থাকে, তবুও সমাজের কল্যাণের জন্যই আমাদের তা স্বীকার করে নিতে হবে। জমির স্বত্বাধিকারে তাঁদের কোন দাবি আছে কি নেই তা নিয়ে মতামত প্রকাশের এতটুকু প্রয়োজন আমি দেখি না।" (১০)

কোটি কোটি কৃষকের পক্ষে সর্ব্বনাশা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তা' চালু করার আগে জমিদারদের জমির মালিকানায় কোনও দাবি আছে কি নেই, সেটুকুও ভেবে দেখবার প্রয়োজন লর্ড কর্ণওয়ালিস দেখলেন না। বৃটিশ আধিপত্যের তাগিদে, ওরফে "সমাজ-কল্যাণের" প্রয়োজনে, তিনি জমিদারদের মধ্যে জমির মালিকানা বেঁটে দিতে "বাধ্য" হলেন।

সে যুগের বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার একজন বিশিষ্ট মুখপাত্র ছিলেন কোলব্রুক সাহেব; জমিদারদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রয়োজন কি এবং কেন তা' তিনি খোলাখুলিভাবেই বলে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

---

৯। এ. বি. কীথ (সম্পাদিত): স্পীচেস এ্যাণ্ড ডকুমেন্টস্ অন ইণ্ডিয়ান পলিসি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৯।

১০। সুরেন্দ্র প্যাটেল কর্তৃক উদ্ধৃত: এ্যাগ্রিকালচারাল লেবরর্স ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড পাকিস্তান (বোম্বাই ১৯৫২), পৃঃ ৪৩।

"ভারতে আমাদের আধিপত্য অব্যাহত রাখবার কাজে ভূস্বামী অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীর প্রয়োজন সর্বাধিক ; জমিদারদের প্রতিপত্তি অপরিসীম ও অপরিবর্তনীয়।" (১১)

অন্যান্যের কথা না হয় না-ই তুললাম ; লর্ড বেণ্টিঙ্ক্ পর্যন্ত এ কথা কবুল করতে বাধ্য হয়েছেন যে অন্যান্য অনেক জরুরী ব্যাপার ব্যর্থ প্রতিপন্ন হলেও "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অন্তত একটি বড় রকমের সুবিধা করে দিয়েছে, তা' হল এই যে এর ফলে এক বিপুলসংখ্যক বিত্তশালী ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়েছে,—বৃটিশ আধিপত্য অব্যাহত রাখবার ব্যাপারে যাদের গভীর স্বার্থ আছে, আর জনসাধারণের উপর যাদের আছে অগাধ প্রভাব প্রতিপত্তি।" (১২)

এই ভাবেই নিছক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বলে ভারতে বৃটিশ সরকার ভারতের পূর্বাঞ্চলের কোটি কোটি কৃষককে বঞ্চিত করে তাদের জমি তুলে দিলেন জমিদারদের হাতে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বঞ্চনা, চিরস্থায়ী শোষণেরই নামান্তর। সেই আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থের কাঠগড়ায় কোটি কোটি মানুষকে নির্বিচারে বলি দেবার এমন নির্মম দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না।

জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা আর জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেবার প্রশ্ন যখন আলোচিত হয় তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই ইতিহাস স্মরণ রাখা দরকার। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই : জমির মালিক জমিদাররা ছিল না ; কৃষককে বঞ্চিত করে জমিদারদের জমি দেওয়া হয়েছিল উৎকোচ হিসাবে—যাতে তারা বৃটিশ শাসনের স্তম্ভ হিসাবে সাগ্রহে কাজ করে। সুতরাং ক্ষতিপূরণের অর্থ যদি কাউকে দিতে হয় তবে

১১। ঐ

১২। কীথ : 'স্পীচেস' ইত্যাদি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৫।

তার এক ও অবিসংবাদী দাবিদার হল কৃষকরা—বেইমান জমিদারদের বেপরোয়া শোষণ ও নির্যাতন যারা এই সুদীর্ঘকাল সহ্য করে এসেছে, তারা।

না, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অজ্ঞ শাসকদের ভালমানুষী ভুলচুক নয়। সর্বগ্রাসী সর্বনাশের এ এক রোমহর্ষক ষড়যন্ত্র। অত্যন্ত সচেতন ভাবেই এই শয়তানী ষড়যন্ত্র এখানে চালু করা হয়েছিল। অভিসন্ধি ছিল কোটি কোটি কৃষকের চিরন্তন বঞ্চনার ভিত্তিতে চিরস্থায়ী শোষণের ছাড়পত্র দিয়ে, সেই ছাড়পত্রের বিনিময়ে বৃটিশ আধিপত্যের সক্রিয় সমর্থনে জমিদারদের সংহত ও সংগঠিত করা। আর এই অভিসন্ধি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই এর প্রবর্তক প্রভুরা ঘোষণা করেছেন তাঁদের বিভিন্ন কথায় ও লেখায়। এই সুস্পষ্ট ঘোষণাগুলি যেন উদ্ধত আসামীর নির্লজ্জ জবানবন্দী। কিন্তু মুষ্টিমেয় মিত্র সৃষ্টি করবার সঙ্গে সঙ্গেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোটি কোটি মানুষের বৃটিশ-বিরোধী ঘৃণাকে করে তুলল আরও তীব্র, আরও তিক্ত। অবশ্য জমিদাররা তাদের প্রভুদের নিরাশ করেনি, পরবর্তী যুগে তাদের ক্রিয়াকলাপে তারা বৃটিশ-আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এসেছে। ভূমি থেকে বিচ্যুত, বঞ্চিত এই কৃষক সমাজই সামিল হল দুঃসাহসিক সংগ্রামের দেশজোড়া ময়দানে জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বৃটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে।

নিজেদের এই শয়তানী দানপত্রের স্বরূপ ঢাকবার মতলবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকপুঙ্গবরা তখন একটি জাঁকালো ফতোয়া জারী করলেন: হ্যাঁ, কৃষকদের জমি তাঁরা জমিদারদের দিয়ে দিচ্ছেন বটে, তবে তার কল্যাণে কৃষকদের উপর নিরঙ্কুশ শোষণ চালাবার "শর্তহীন ছাড়পত্র" জমিদাররা পেয়ে যায়নি; "যাতে কৃষকদের স্বত্বাধীন সম্পত্তিতে অন্যায়ভাবে কোন ওলটপালট না ঘটানো হয় (অহো!), যাতে অযৌক্তিক ভাবে কোন কোন টাকা তাদের কাছ থেকে আদায়

না করা হয় (কি দরদ ! !)—তার ব্যবস্থা করবার জন্য সমস্ত আইন-কানুন করার ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে রাখা হল।" (১৩)

কৃষক সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য 'সহৃদয়' উৎকণ্ঠার এই যে উচ্চকণ্ঠ উচ্ছ্বাস, বাস্তবে এর প্রকাশ হয়েছে কি কি আকারে ?

দুটি নমুনা এখানে দেওয়া হল :

১৭৯৭ সালে লর্ড ওয়েলেসলি সম্পত্তি ক্রোকের আইন পাশ করেন, পরে এই আইন 'হুফ্‌তুম' আইন নামে কুখ্যাতি অর্জন করে। এই আইন অনুযায়ী কৃষকদের "গ্রেফতার ও আটক করা চলবে ; ক্রোক-যোগ্য সম্পত্তির সন্ধানে পুলিস দুয়োর ভেঙে তাদের ঘরে ঢুকতে পারবে ; এই দ্রুত পদ্ধতি প্রয়োগ করবার ফলে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতীকারের জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারবেন।" (১৪) কয়েক বছরেই জমিদারের প্ররোচনায় পুলিস কর্তৃক মাল ক্রোকের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা জমে উঠল।

সরকার তখন কি করল ?

সরকার তখন তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অর্থাৎ জমিদারদের অনুরোধ অনুসারে ১৮১২ সালের 'রেগুলেশন—৫' পাশ করল—যে আইন সাধারণ্যে 'পঞ্জাম' নামে পরিচিত। এই আইনের মহিমায় আদালতের আশ্রয় নেবার যে লোকদেখানো ব্যবস্থাটুকু ছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল। রেগুলেশনে বলা হল, "উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে যদি কোন রায়ত জমিদার কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব-সংগ্রহকারী কোন উর্ধতন বা অধস্তন কর্মচারীকে আদালতে হাজির করাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে

১৩। আজিজুল হক কর্তৃক উধৃত : ম্যান বিহাইণ্ড দি প্লাউ ; কলিকাতা (১৯৩৯) পৃঃ ২২৬]

১৪। অভয়চরণ দাস : দি ইণ্ডিয়ান রায়ত, ল্যাণ্ড ট্যাক্স, পারমানেণ্ট সেট্‌লমেণ্ট এ্যাণ্ড দি ফ্যামিন (কলিকাতা, ১৮৮১ : পৃঃ ৩২ এবং পৃঃ ৬৪১।

অথবা এমন কিছু করে যার ফলে উক্ত কর্মচারীকে আদালতে হাজির হতে হয়, তবে সেই রায়তকে ক্ষতিপূরণের দায়ে সোপর্দ করা যাবে; যদি কোন রায়ত ভিত্তিহীন অভিযোগে জমিদারের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করে, তবে তাকে জরিমানা ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।" (১৫)

এই অবদান সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জমিদার ছাড়াও আর এক ধরনের শোষণকারী শ্রেণী বিদেশী শাসকদের পক্ষপুটে প্রশ্রয় ও পুষ্টি লাভ করে। তারা হল মহাজন। পল্লীসমাজের অতি সামান্য কর্মচারী ছিল দোকানদার-হিসাবনবীশেরা; বৃটিশ শাসনের দৌলতে এই সামান্য কর্মচারীরাই রূপান্তরিত হল রক্তচোষা মহাজনে। বৃটিশ শাসনের আগেকার ভারতে রাজস্ব আদায় হত ফসলে সুতরাং ফলনের পরিমাণের সঙ্গে এই রাজস্বের একটি আনুপাতিক হার বাঁধা ছিল। কিন্তু বৃটিশেরা এসে ফসলের বদলে টাকায় রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করল; রাজস্বের পরিমাণ বাঁধা হল অত্যন্ত চড়া হারে; ফলনের পরিমাণের সঙ্গে এর কোন যোগই রইলনা। রাজস্বের এই মারাত্মক দাবি মেটাতে গিয়ে কৃষকরা টাকা ধার করবার জন্য মহাজনদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হত। স্বাভাবিক বছরেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে অজন্মা বা কম ফলনের বছরে যে কি অবস্থা হত তা' সহজেই অনুমেয়।

ভারতের পল্লীসমাজের ব্যবস্থায় জমি কখনও ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য হিসাবে গণ্য হত না। কিন্তু বৃটিশ আমলে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেবার ব্যবসা চালু হল। যথাসময়ে সুদে আসলে টাকা শোধ না করতে পারলে দেনাদারের বন্ধকী জমি বাজেয়াপ্ত হত, পাওনাদারদের কবলে চলে যেত। একবার যদি কোন চাষী ধারের ফাঁদে

১৫। ঐ পৃঃ ৩২।

পা দিতে বাধ্য হত তা হলে যোগবিয়োগের কেরামতিতে তার জমি-জমা যে শেষ পর্যন্ত মহাজনের কুক্ষিগত হয়ে যেত, এ প্রক্রিয়া ছিল অনিবার্য। এই অমোঘ প্রক্রিয়ার অজস্র প্রসাদে মহাজনরাও ভূস্বামীতে পরিণত হল।

মহাজনদের চক্রান্তগুলি যাতে সহজে কার্যকরী হয় সেজন্য বৃটিশ শাসকরাও প্রয়োজনীয় আইনকানুন প্রণয়ন করল। এই আইনকানুন অনুযায়ী মহাজনরা বলপূর্বক কৃষকের জমি হস্তগত করার অধিকার পেল। ফল হল পাইকারী হারে কৃষক-উচ্ছেদ, বিশেষ করে রায়তী অঞ্চলে।

সুতরাং অবস্থা যখন অসহনীয় হয়ে উঠত তখন বিক্ষুব্ধ কৃষকরা যে জমিদার ও মহাজন—এই যমজ শয়তানের বিরুদ্ধেই তাদের প্রচণ্ডতম আঘাত হানবে, তা একান্তই স্বাভাবিক। জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মারফতই তারা বুঝতে পারল যে সরকারও তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সামিল হয় জমিদার মহাজনদের স্বপক্ষে, কৃষকদের বিপক্ষে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাঁওতাল বিদ্রোহ

"দুরাচার এই দারোগা শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায়; আমরাও দেখতে চাই সমস্ত সাঁওতালকে বাঁধবার মত কতটা দড়ি সে জোগাড় করতে পারে।"

—মহেশ লাল দত্ত নামক জনৈক দারোগার উদ্দেশ্যে

অন্যতম সাঁওতাল নেতা 'গোচো'র জবাব।

সাঁওতালরা ছিল নিরীহ, নিরভিমান। সাবেকী প্রথায় চাষবাস করে তারা তাদের জীবিকা অর্জন করত। সাঁওতালদের তারিফ করে স্যর জর্জ ক্যাম্বেল বলেছিলেন, "অরণ্য উদ্ধার ও আবাদে পরিণত করার ব্যাপারে তারা যে শুধু শ্রমসহিষ্ণু তাই নয়, সুকৌশলীও বটে।" (১)

শত শত বছর ধরে যে জমি তারা চাষ করে এসেছে, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই জমিই রাতারাতি জমিদারদের কবলে চলে গেল। জমি তো চলে গেল পরের হাতে, কিন্তু তাদের কাঁধে চাপল চড়তি খাজনার বাড়তি বোঝা। এই নতুন বিলি ব্যবস্থায় সাঁওতালরা যে স্বস্তি অনুভব করল না, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় এই মানুষগুলি প্রতিবাদ করলেও প্রতিরোধ করল না। হাঙ্গামা এড়াবার জন্য তারা কটক, ধলভূম, মানভূম, বরভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা ছেড়ে গেল রাজমহল পাহাড়ের প্রান্তবর্তী সমতলে। (২) সেখানে প্রকৃতি আর জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে, বনবাদাড়

---

(১) অভয় চরণ দাস, দি ইণ্ডিয়ান রায়ত, পৃঃ ৫৬৪-৫

(২) ক্যাপ্টেন ওয়াল্টার শেরওয়েল, 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি' অব বেঙ্গল, ১৮৫১।

উদ্ধার করে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আবার তারা আবাদ বসাল। নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা বসতি স্থাপন করল নতুন অঞ্চলে, শুরু করল নতুন এক জীবন। সে সময়ে এই অঞ্চলকে বলা হত দমন-ই-কো। স্যর জর্জ ক্যাম্বেলের ভাষায় তখন তাদের অবস্থা ছিল এই ঃ

> "যে প্রথম চাষ করে জমি তারই—সঙ্গতভাবেই তারা এই ধারণা পোষণ করে থাকে। যদি সেখান থেকে উৎখাত হয়, তারা বরং বন-জঙ্গলে চলে যাবে এবং এমন কোন অঞ্চলে তারা আবাদ করবে, বসতি স্থাপন করবে যেখানে তাদের উপর নির্যাতন চালান হবে না। দুঃখের বিষয়, এইভাবে পিছিয়ে যেতে যেতে তারা একেবারে শেষ সীমায় এসে পড়েছে ; এসে পড়েছে গাঙ্গেয় সমতলের প্রান্ত সীমায়, যেখানে জমির জন্য প্রতিযোগিতা হল তীব্রতম আর খাজনার হার হল উচ্চতম।" (৩)

এই নতুন অঞ্চলে কিন্তু বেশিদিন তারা নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারল না। যে জমিদারশ্রেণী পুরানো বাসভূমি থেকে তাদের বিতাড়িত করেছিল, অনতিবিলম্বে এই নতুন বাসভূমিতেও সেই জমিদারদের লোভাতুর হাতের বিষাক্ত থাবা প্রসারিত হল। বনবাদাড় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত জমিদাররা থাকত নীরব, নিষ্ক্রিয়। কিন্তু বনবাদাড় পরিষ্কার হতে না হতেই জমিদাররা সেখানে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসত, জমির মালিকানা দাবি করত, খাজনার জন্য হাত বাড়াত। ১৮৫৬ সালে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে, "দমনের কাছাকাছি যে লোভী জমিদাররা থাকে, কিছুদিন হল তাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে সাঁওতালদের জমির উপরে।" একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উক্ত পত্রিকা নীচেকার ঘটনাটি বিবৃত করে ঃ

(৩) অভয় চরণ দাস, 'দি ইণ্ডিয়ান রায়ত', পৃঃ ৫৬৪-৬৫

"গঙ্গাধর একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার। 'তুপে' তার জমিদারী। তুপের সীমানা-স্তম্ভ ছুঁয়ে আছে দমনের সীমানা-স্তম্ভকে। স্তম্ভের এদিকে দমনের সীমানার মধ্যে মাণিক সাঁওতালের সুন্দর একখানা ফসলী জমি। এই জমি সে লালন করছে অপার যত্নে। পাঁচ পাঁচটি বছর ধরে মাণিক এই জমির খাজনা দিয়ে আসছে। গঙ্গাধরের পূর্বপুরুষই লেখাপড়া করে এই জমি মাণিককে দিয়েছিল; কোনক্রমেই গঙ্গাধর এই জমি দাবি করতে পারে না। মাণিক মাসে মাসে ছ'আনা করে দিয়ে এসেছে; এখন তার কাছ থেকে আরও দু'টাকার মত 'যৎসামান্য কিছু' আদায় করার ব্যাপারে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি গঙ্গাধরের চোখে পড়ে না। গঙ্গাধরের যুক্তি, বছরের বাকি সময়ের জন্য মাণিক সাঁওতাল তার মাসিক দেয় থেকে রেহাই পাবে!" (৪)

নয়া দুমকার ডেপুটি কমিশনার মিঃ টমসনের কাছে শ্রীখণ্ডের এ্যাসিস্টান্ট কমিশনার মিঃ টেইলর এক পত্রে জানান যে সাঁওতালরা মহেশতলা আর পাকুড়ের রাজাদের ঘৃণা করে কেননা তাঁরা সাঁওতালী গ্রামের ইজারা দিয়েছে অ-সাঁওতালী বাঙ্গালী জমিদার ও মহাজনদের কাছে। (৫)

'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর একজন সমসাময়িক লেখক তৎকালীন পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে:

"জমিদার পুলিস, তহশিলদার আর আদালতের আমলারা মিলে নম্র ও নমনীয় প্রকৃতির সাঁওতালদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে বে-আইনী আদায়, জবরদস্তিমূলক আদায়, জোর করে সম্পত্তি থেকে

---

(৪) 'ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৫৬', পৃঃ ২৩৮-৪০

(৫) কালীকিঙ্কর দত্ত, 'দি সানটাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭' (ক্যালকাটা, ১৯৪০) পৃঃ ৭।

উচ্ছেদ, মারধোর, গালিগালাজ, ছোটখাট আর নানা রকমের অত্যাচারের এক নিরেট ব্যবস্থা। শতকরা ৫০৲ টাকা থেকে ৫০০৲ টাকা পর্যন্ত স্থদের হার, হাটে বাজারে ওজন করবার ভুয়ো বাটখারা, বড়লোকদের গরু-মোষ-ঘোড়া মতলব করে গরীব মানুষদের ক্ষেতে বেআইনী ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া—এসব একটা রেওয়াজেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সাঁওতালদের কাছ থেকে সংভাবে জীবন যাপনের মুচলেকা এবং তার জন্য জামানত তলব করার ব্যবস্থাও চালু আছে। দেনার জন্য আজেবাজে হলফ করানো হল আর এক রকমের উৎপীড়ন।" (৬)

স্থতরাং, জমিদার-পুঙ্গবেরা ছাড়াও ছিল মহামতি মহাজনেরা। স্থদের যে হার তারা আদায় করত তা অবিশ্বাস্য রকমের চড়া। এ সম্পর্কে 'ক্যালকাটা রিভিউ' লিখেছে, "আসলের দশ গুণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবুও দেনার দায় চুকে যায়নি ; আর এই মিথ্যা দেনার অজুহাতেই 'ঋণগ্রস্ত' সাঁওতালের ফসল, গরুবাছুর, এমনকি সপরিবারে নিজেও সে মহাজনের স্বত্বাধীনে চলে গিয়েছে।" (৭)

এই লাভের ব্যবসার গন্ধ পেয়ে অনেক মৌমাছিই সাঁওতালী অঞ্চলের মৌচাকে এসে ভীড় জমাল। বর্ধমান ও বীরভূম থেকে ময়রা আর বানিয়ারা এবং সাহাবাদ, ছাপরা, বেতিয়া ও আরা থেকে ভোজপুরী ভাটিয়ারা সাঁওতাল অঞ্চলে আড্ডা গাড়ল। "পাহাড়ী অঞ্চলের রাজধানী" ছিল বরাহাইত। এই বরাহাইতের "লোক সংখ্যা ছিল বেশ বড় রকমের ; বাঙ্গালী ব্যবসায়ী পরিবারই ছিল পঞ্চাশ ঘর।" প্রতি সপ্তাহে দুবার ক'রে সেখানে বাজার বসত। সেই বাজারে সাঁওতালরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি নিয়ে আসত। ব্যবসায়ীরা

(৬) ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৫৬

(৭) ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৬০

তাদের কাছ থেকে সেই সব দ্রব্য কিনে নিত। তার বিনিময়ে যে দাম তারা দিত "সত্যিকারের মূল্য থেকে" তা' অনেক অনেক কম। (৮)

সেখানে থেকে বিপুল পরিমাণে ধান, চাল, সরষে এবং অন্যান্য তৈলবীজ দিয়ে গরু ও মোষের গাড়ী বোঝাই করে ব্যবসায়ীরা যাত্রা করত ভাগিরথীর তীরে জঙ্গীপুরের পথে। জঙ্গীপুর থেকে এই দ্রব্য-সম্ভার যেত মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায়। "এই সরষের একটা বড় অংশ রপ্তানী হত ইংলণ্ডে।"

এর উপর আবার ছিল রেলপথ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ইউরোপীয় সাহেবদের অত্যাচার। এ সম্পর্কে ১৮৫৬ সালের 'ক্যালকাটা রিভিউ' থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট। "রেলওয়ের সাহেবরা কোন দাম না দিয়েই সাঁওতালদের ছাগল মুরগী ইত্যাদি নিয়ে যায়; ছুটি সাঁওতাল মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এই ভাবে ধরে-নেওয়া মেয়েদের মেরে ফেলবার ঘটনাও বিরল নয়।" (৯)

জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, সাহেব এবং সরকারী কর্মচারীরা সাঁওতালদের উপর অকথ্য ব্যাভিচার ও অসহ্য নির্যাতন চালাচ্ছিল। সাঁওতালদের স্বভাবসুলভ শান্তিপ্রিয়তাকে এরা ধরে নিয়েছিল ভীরুতা বলে। যত দিন গেল এই অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই চলল। এর ফলে দেখা দিল দারুণ বিক্ষোভ। ১৮৫৬ সালের 'ক্যালকাটা রিভিউ'এর পাকুড়-নথিপত্রে দেখা যায় যে প্রকাশ্য অভ্যুত্থান আরম্ভ হবার আগে ১৮৮৫ সালেই সাঁওতালদের গ্রামসমিতিগুলি "কোন পথে অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে তাই নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিল।" শেষ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্য অভ্যুত্থানের পথেই পা বাড়াল। "সহজ, সরল এই মানুষগুলি মুখ বুজে ধৈর্য ধরে যে একটানা নির্যাতন সহ্য করে এসেছে"

(৮) জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৫১, পৃঃ ৫৬৬, ৫৭৪-৬।

(৯) দত্ত, 'দি সানতাল ইনসারেকশন……, পৃঃ ৮

সেই নির্যাতনই অবশেষে তাদের এই পথে পা বাড়াতে বাধ্য করল। ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩০ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে সরকার যে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি, তা তার আচরণ থেকেই বোঝা যায়।

১৮৫৪ সালে যেসব ঘটনা ঘটে তা ধূমায়িত বিক্ষোভেরই ইতস্তত প্রকাশ। নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পরে সাঁওতালরা মহাজন ও জমিদারদের কাছ থেকে ধনদৌলত কেড়ে নিতে আরম্ভ করল। এই ভাবে যাদের কাছ থেকে জমিদার মহাজনরা এই ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করেছিল, তাদের হাতেই আবার তা ফিরে গেল। এই কাজ হয়ত আইন-সঙ্গত হয়নি, কিন্তু তাই বলে কি ন্যায়সঙ্গত নয়? 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর এক সমসাময়িক লেখকের মতে এই কাজ হল "অকারণ নিষ্ঠুরতার সমুচিত প্রতিশোধ।" পাকুড়ের উকিল দিগম্বর চক্রবর্তী যে বিস্তারিত বিবরণ দেন তা' থেকে জানা যায়, লছিমপুরের সাসানের বীর সিংহের নেতৃত্বে সাঁওতালরা যেসব গোপন সভা করছিল, তার ফলে ময়রা আর ডিকুদের (সাঁওতালরা বাঙ্গালীদের ঐ নামে ডাকত) মনে ভয় ঢুকে যায়। এই সব সভায় যারা অংশ নিত তাদের মধ্যে বৈরোর বীর মাঝি, সিন্দ্রীর কাতলে পরামানিক, হাটবাঁধার দোমন মাঝির নাম উল্লেখযোগ্য। মহাজন আর কর্মচারীরা সাহায্যের জন্য অম্বা পরগণার জমিদার রাণী মোক্ষদাসুন্দরীর শরণাপন্ন হল। রাণীর দেওয়ান জগবন্ধু রায় বীর সিংহকে ডেকে পাঠাল—জমিদারী কাছারীতে হাজির হবার জন্য। "বীর সিংহের অনুচরদের সামনেই বীরসিংহকে নির্মমভাবে জুতাপেটা করা হল," তার উপর আবার উঁচু হারে জরিমানাও করা হল। (১০)

সাঁওতাল কৃষকদের মনের অবস্থা তখন কি রকম ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় সাঁওতাল নেতা গোচোর তেজোদ্দীপ্ত উক্তি

(১০) এল এস. এস ওম্যালি—'বেঙ্গল, বিহার এণ্ড উড়িষ্যা (১৯১৭) পৃঃ ২৫৫।

থেকে। মহেশ লাল দত্ত নামে জনৈক দারোগা সাঁওতালদের উপর যথেষ্ট নির্যাতন চালাচ্ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করে গোচো বলেন,

"এই দুরাচার দারোগা শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায়; আমরাও দেখতে চাই সমস্ত সাঁওতালকে বাঁধবার মত কতটা দড়ি সে জোগাড় করতে পারে।" (১১)

আসন্ন ঝড়ের এ হল পূর্বাভাস। কিন্তু ঝড়ের আগের এই স্তব্ধতাকে সরকার ভুল করল কাপুরুষের ক্লীবতা বলে।

মহেশ দারোগার অত্যাচার বিক্ষোভের আগুনে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাল। ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগের ছ'সাত হাজার সাঁওতাল জমায়েত হোল "গত বছর তাদের সহযোদ্ধাদের উপর যে দণ্ড বিধান করা হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য।" তাদের অভিযোগ: "মহাজনদের বে-আইনী আদায় বন্ধ করবার জন্যই তাদের সহযোদ্ধারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছিল। তাদের সহযোদ্ধাদের সাজা দেওয়া হল অথচ এই মহাজনরা বহাল তবিয়তেই বজায় রইল। (১২)

এই সভার সিদ্ধান্তগুলি অন্যান্য সাঁওতালদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত একটা শালগাছের প্রতীকের মারফত। আজও পর্যন্ত এই প্রতীক ব্যবহৃত হয় ঐক্যের নিশানা হিসাবে এবং গোপন সংবাদ ছড়িয়ে দেবার অভিজ্ঞান হিসাবে। ২৮৫৫ সালের ১০ই জুন তারিখে ৪০০ গ্রামের প্রতিনিধি ১০০০০ সাঁওতাল জড়ো হল ভগনদীঘি নামক জায়গায়। সেই সভায় সিদ্ধান্ত হল, অত্যাচারীদের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এক হয়ে দাঁড়াবার সময় এসে গেছে। সভার নির্দেশ অনুসারে "কীর্তা, ভাদু, সুন্নো এবং সিধু চিঠি লিখল বীরভূমের

---

(১১) দত্ত, 'দি সানতাল ইনসারেকশন.........' পৃঃ ১২।

(১২) ঐ পৃঃ ১২।

ম্যাজিষ্ট্রেট, দীঘি আর রাজমহল থানার দারোগা, কয়েকজন জমিদার এবং অন্যান্যদের কাছে।" জমিদারদের কাছে তারা সরাসরি চরমপত্র পাঠাল "১৫ দিনের মধ্যে জবাব" দাবি করে। (১৩)

মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য, "দেশ দখল করে তাদের মনোমত সরকার কায়েম করবার জন্য" তারা যে সংকল্পবদ্ধ, তাও এই নেতাদের চিঠিতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হল। (১৪) কেউ অবশ্য জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

সাঁওতালদের দাবিদাওয়ার প্রতি সরকার বিমুখ হয়ে থাকলেও, অন্যান্য অ-সাঁওতাল জনতা এগিয়ে এল তাদের সমর্থনে। ১৮৫৫ সালের ২৮শে জুলাই ভাগলপুরের কমিশনার বাংলা সরকারের সেক্রেটারীর কাছে যে চিঠি লেখেন তা থেকে এই জনসমর্থনের ব্যাপকতা আঁচ করা যায়ঃ

"বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণীগুলিতে দেখা যায় যে গোয়ালা, তেলী এবং অন্যান্য বর্ণের লোকেরা সাঁওতালদের পরিচালনা করছে এবং পীড়নমূলক কাজে প্ররোচনা দিচ্ছে; এই সমস্ত লোক সাঁওতালদের খবরাখবর সরবরাহ করে; তাদের হয়ে ঢেড়া পেটায়; তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে এবং তাদের গুপ্তচরের কাজ করে। এই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে, আর যে-সব লোহার এদের তীর ও কুঠার তৈরি করে দেয় তাদের বিরুদ্ধে সমুচিত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকার যদি কোন ফতোয়া জারি করার কথা মনস্থ করেন, তবে বিদ্রোহীদের তালিকায় এদেরকেও অবিলম্বে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।" (১৫)

---

(১৩) দত্ত কর্তৃক 'দি সানতাল ইনসারেকশন……" নামক বইয়ে উধৃত পৃঃ ১৪।

(১৪) ঐ পৃঃ ১৫-৬।

(১৫) 'ক্যালকাটা রিভিউ'—১৮৫৬।

এই ভাবে বুকে আশা, মুখে গান আর হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে সাঁওতাল কৃষকরা সামিল হল প্রকাশ্য অভ্যুত্থানে। জমিদার, মহাজন আর সরকার—এই ত্রিমূর্তি শয়তানের বিরুদ্ধেই তাদের এই দৃপ্ত অভিযান।

দারোগা মহেশ দত্তই হল তাদের আশু লক্ষ্য কারণ এই ধুরন্ধরই ১৮৫৪ সালে সাঁওতালদের উপব নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই দারোগা সমবেত সাঁওতালদের উপদেশ দিল, "শান্ত ভাবে ফিরে গিয়ে চাষের কাজে মন দিতে, যাতে করে খাজনা দেবার বেলায় তাদের অসুবিধায় না পড়তে হয়।" (১৬) শেষ মুহূর্তে অবশ্য এই পরম উৎকণ্ঠার জন্য দারোগা মহেশলাল চরম মূল্যই পেল। ক্ষণকালের মধ্যে তার মাথাটি ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে থুবড়ে পড়ল। সাঁওতালরা এগিয়ে চলল। বিক্ষুব্ধ সাঁওতালদের এই উত্তাল বিক্ষোভের সম্মুখে জমিদারের প্রতিনিধি, মহাজন আর ব্যবসায়ীরা ঊর্ধশ্বাসে পলায়ন করল। বিদ্রোহী সাঁওতালরা আরও আরও এগিয়ে চলল ;—অগ্রগতির পথে লব্ধ জয় সংহত করে যেতে তারা ভুলল না। বোরিও এবং কোলগঙের মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার পরে তারা ভাগলপুর আর রাজমহলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

যেন আচমকা একটা কিছু ঘটেছে—সরকারীভাবে এমন একটা বিস্ময়ের ভান করে সরকার ব্যাপক প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিল। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হল অবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। জমিদার আর মহাজনদের উপর হুকুম হল বিদ্রোহ দমাবার কাজে পুলিশ ও সামরিক শক্তিকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে।

দাবানলের মত এই অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়তে লাগল নতুন নতুন এলাকায়। ১৮৫৫ সালের ১লা জুলাই মিঃ বার্নেস নামে জনৈক

(১৬) দত্ত, 'দি সানতাল ইনসারেকশন,' পৃঃ ১৬।

নীলকর কুঠিয়াল ভাগলপুরের কমিশনারকে লেখে যে তার এলাকায় এক ব্যাপক বিদ্রোহ ফেটে পড়েছে ;—সুতরাং অবিলম্বে সরকারী সাহায্য দরকার। ১১ই জুলাই এই সাহেবটি কমিশনার মহোদয়ের কাছে আর একখানা চিঠি পাঠায়, তা থেকে বোঝা যায় কোন পথে এই বিদ্রোহ অগ্রসর হচ্ছে। "খবর এসেছে, খুব ছোট ছোট দলে এই বিদ্রোহীরা ঘুরে বেড়ায় কিন্তু মাদলের আওয়াজ শুনলেই হাজার দশেক লোকের এক একটি বাহিনী এক জায়গায় এসে জড়ো হয়।"

অন্যান্য গণঅভ্যুত্থানের মত এক্ষেত্রেও গেরিলা যুদ্ধ আর বাহিনী-যুদ্ধ —এ দুয়ের পরিপূরক কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল। ভারতের রাজনীতিতে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের আবির্ভাব একটা যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতের মাটিতে এই প্রথম গণফৌজের আবির্ভাব;—ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে এ বাহিনী তৈরি নয়, এ বাহিনী তৈরি হয়েছিল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় সংগঠিত বিদ্রোহী কৃষকদের নিয়ে। অত্যন্ত অল্প সময়ের বিজ্ঞাপনে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ এক জায়গায় জড়ো হত, আবার ছড়িয়ে পড়তে পারত—এই ঘটনা বিদ্রোহী কৃষকদের সংগঠন ও শৃঙ্খলার পরম নিদর্শন। উল্লেখযোগ্য যে এই কৃষকযোদ্ধাদের এর আগে কোন সামরিক শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিলনা।

ভাগলপুর আর রাজমহলের মধ্যবর্তী ডাক ও রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা হয়। দুটি শহরের অন্তবর্তী অঞ্চল বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পীরপৈঁতি থেকে সকরিগলি পর্যন্ত সড়কও তাদের করতলগত হয়। পীরপৈঁতি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এমন কয়েকজনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বিদ্রোহীরা ঘোষণা করে দিয়েছিল, "কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে ; তাদের নিজেদের সুবার আমল শুরু হয়ে গিয়েছে।"

মেজর বারোকে মোতায়েন করা হয় পীরপৈঁতিতে। ১৮৫৫

সালের ১৬ই জুলাই বেলা দুটোয় বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষে এই মেজরটি দারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আধ ডজন অফিসার আর দু' ডজনেরও বেশি সৈন্যের মৃতদেহ রেখে এই বীরপুরুষটিকে পালিয়ে যেতে হয়। তার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, "বিদ্রোহীরা দৃঢ়ভাবে তাদের ঘাঁটি আগলে থাকে। কেবল হাত দিয়েই তারা ধনুর্বাণ চালাচ্ছিল তাই নয়; আর এক রকমের ধনুক তারা ব্যবহার করছিল যা ছুঁড়তে হয় মাটির উপর বসে পা দিয়ে; এ ছাড়া লড়াই করবার টাঙ্গী তো আছেই।"

৪০নং রেজিমেণ্ট সহ শাকবুর্গকে, হিলরেঞ্জার বাহিনীর সহ লেপ্টেন্যাণ্ট ফাজানকে এবং তদুপরি ৭নং রেজিমেণ্টকেও ঘটনাস্থলে বিদ্যুৎবেগে পাঠানো হয়। সরকার দারুণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

১৯শে জুলাই সামরিক আইন জারি করা হল। ঘোষণায় বলা হল, কৃষক উত্থান "বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছে।" সুতরাং "অস্ত্রশস্ত্র-সহ কোন বিদ্রোহীকে দেখতে পেলে তাকে ধ্বংস করে ফেলার" নির্দেশ দেওয়া হয়। নেতাদের গ্রেফতার করবার জন্য অনেক অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়ঃ প্রধান নেতার জন্য ১০,০০০৲ টাকা, প্রত্যেকজন দেওয়ানের জন্য (৩।৪ জন আছে বলে ধরা হত) ৫০০০৲ টাকা আর ছোটখাট প্রত্যেকজন নেতার জন্য ১০০০৲ টাকা। "বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ করবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের" যাবতীয় ক্ষমতাই সামরিক বিভাগের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বিদ্রোহ দমনের জন্য পাশবিক নিষ্পেষণ। কিন্তু এই নির্মম পাশবিকতা সত্ত্বেও বিদ্রোহ নতুন নতুন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। গোড্ডা, পাকুড়, মহেশপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম বিদ্রোহীদের পদভারে কেঁপে উঠল। লিটিপারু নামক জায়গার ইশ্রী

ভক্ত, তিলক ভক্ত আর তুতা ভক্ত—নামের দিক থেকে শান্তশিষ্ট গোবেচারা ভগবদ্‌ভক্ত হলেও কাজের দিক থেকে তারা ছিল অত্যাচারী সুদখোর পাষণ্ড। "দেনাদারদের উপর অমানুষিক নৃশংসতার নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগের জন্য এমনকি 'ভক্ত'দের মধ্যেও এরা কুখ্যাত ছিল।" এই তিন ভক্ত-পাষণ্ড বিদ্রোহীদের হাতে ঘায়েল হল।

নিম্নবর্ণের ডিকুরাও (অ-সাঁওতালরা) সাওতালদের সমর্থনে এগিয়ে এল। এই ভাবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নতুন নতুন অ-সাঁওতাল জনতার যোগদানের ফলে বিদ্রোহীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। এবার তারা অভিযান চালাল সংগ্রামপুরের দিকে। সেখান থেকে সিদ্‌বু, কান্‌হু, চাঁদ আর ভৈরবের সম্মিলিত নেতৃত্বে তারা পাকুড় অবরোধ করল। তিন দিন অবরোধের পর তারা পাকুড় দখল করল। ঐ অঞ্চলের সবচাইতে ধনী মহাজন ছিল দীনদয়াল রায়। অন্যান্য জমিদার, মহাজন আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গ যখন উর্ধশ্বাসে পাকুড় ছেড়ে পালাচ্ছিল, তখন বিশাল কলেবর এই ভদ্রলোকটি মেদভারে পেছনে পড়ে যায়। জগন্নাথ সর্দার ছিল তার ক্রীতদাস; দীনদয়ালের নির্দয় অত্যাচারে সে আজীবন লাঞ্ছিত হয়েছে। এই জগন্নাথ দীনদয়ালকে ধরে নিয়ে এল বিদ্রোহী সাঁওতালদের সামনে। সেখানে একখানা টাঙ্গীর ঘায়ে সে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল। কাটবার সময় সে চীৎকার করে বলতে থাকে, "এই আঙ্গুল দিয়ে তুই সুদ আর বাটপাড়ির টাকা গুণতিস্! এই হাতে তুই গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতিস্!" দীনদয়ালের মুণ্ডটিকে নিকটবর্তী শিবচক্রপানীশ্বরের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে একটা খোলা খুপরীর মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে সেটা রেখে দেওয়া হয়—যাতে অন্যান্য অত্যাচারী সেটা দেখে শিক্ষা পেতে পারে।

সরকারের পাল্টা আক্রমণও শুরু হয়েছিল পূর্ণ উদ্যমে। ১৩নং রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস, ৭নং রেজিমেণ্টের লেপ্টেনাণ্ট লসকার্ট, ৪২নং রেজিমেণ্টের কর্ণেল লিপট্র্যাপকেও পাঠানো হয় বিদ্রোহ দমনের কাজে। মাসিক ৩০৫০৲ টাকা খরচ করে ১০০০ গাড়োয়ালীকে নিয়োগ করা হল "জেলার পথ ঘাট পাহারা দেবার জন্য।" জমিদার আর মহাজন স্বভাবতই সমস্ত শক্তি সামর্থ নিয়ে সামিল হল সরকারের সাহায্যে।

ভাগলপুর ও নিকটবর্তী জিলাগুলির জমিদাররা রণক্ষেত্রের বিভিন্ন সীমান্তে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর সাহায্যার্থে তাদের হাতীগুলো পর্যন্ত ধার দেবার জন্য এগিয়ে এল। তারা জানালো যে, "হাতীগুলোকে ভাল করে রাখলেই চলবে", "ভাড়া দিতে হবে না।" মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমও "নিজ খরচায় একপাল হাতী" পাঠাল। ২৭শে সেপ্টেম্বর বর্ধমানের কমিশনার লেখেন, "ইওরোপীয় নীলকররা বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত সৈন্যদের অর্থ সরবরাহ করছে।"

এই ভাবে সমস্ত শক্তি সমাবেশ করে, সমস্ত নৃশংসতা দিয়ে সরকার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হল। ৪০ নং রেজিমেণ্টের পরিচালনা-ভার ছিল ক্যাপ্টেন শেরউইলের উপর, ২৯শে জুলাই সন্ধ্যায় এক অভিযানে এই ক্যাপ্টেনটি "ধ্বংস করল ১২ খানা গ্রাম"। মেজর শাকবুর্গ সদলবলে অগ্রসর হল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দেদে'র উদ্দেশ্যে; সেখান থেকে খোনেরার মধ্য দিয়ে পাহাড় ঘুরে সে এগিয়ে গেল উত্তর-পূর্বে লোহন্দিয়া নামক জায়গায়। এই অভিযানে সে "১৫ খানা গ্রাম ধ্বংস করল এবং উক্ত অঞ্চলকে বিদ্রোহীদের দখল থেকে পুনরুদ্ধার করল।" ২৯শে জুলাই সন্ধ্যায় মেজর বারোজ লেপ্টেনাণ্ট গর্ডেনকে পাঠাল "মানহান আর মানকাত্রো নামে দুটি সাঁওতাল গ্রাম লোপাট করবার জন্য।" পরদিন "লেপ্টেনাণ্ট রুবি উত্তর পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে ভুগিয়া, তিতেরিয়া, বুসকুদার, রঙ্গকিতা, হুরিয়ালিয়া এবং

বোকাই গ্রামের ধ্বংসকাণ্ড সমাধা করল।” ৩৬টি সাঁওতাল গ্রামের নৃশংস ধ্বংসলীলা বর্ণনা করা হয়েছে একান্ত নিরুদ্বেগ মেজাজে।

সাঁওতাল কৃষকদের উষ্ণ রক্তে রাজমহল পাহাড় রঞ্জিত হল। সহস্র রক্তধারা পরিণত হল একটি রক্ত প্রবাহে, আর সেই রক্ত-প্রবাহ বয়ে গেল গঙ্গার বুকে; গঙ্গার জলধারা শহীদের রক্তস্পর্শে আরও পবিত্র হয়ে উঠল। কিন্তু এই মারাত্মক ধ্বংসকাণ্ডের মুখেও সাঁওতালরা তাদের ঘরদোর রক্ষা করতে লাগলো অমিত বিক্রমে, অনমনীয় দৃঢ়তায়। ওম্যালি সাহেবের দেওয়া একটি সংঘর্ষের বিবরণী থেকেই তাদের শৌর্য ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়:

“যে বেপরোয়া সাহস তারা দেখালো, তার তুলনা নেই। পরাজয় তারা মানেনা, আত্মসমর্পণ তারা জানেনা। একবার ৪৫ জন সাঁওতাল একখানা মাটির ঘরে আশ্রয় নিয়ে, সেপাইদের আক্রমণের মুখেও তা' আগলে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ চলল; মাঝে মাঝে তাদের আহ্বান জানান হল আত্মসমর্পণের জন্য। প্রত্যেকটি বার সাঁওতালদের পক্ষ থেকে উত্তর এল ঝাঁকে ঝাঁকে তীরের মুখে। অবশেষে যখন সেপাইরা ঐ কুটিরে ঢুকতে সক্ষম হল, তারা দেখল একটি মাত্র বৃদ্ধ সাঁওতাল বেঁচে আছে। জনৈক সেপাই তাকে আহ্বান জানাল আত্মসমর্পণ করতে। জবাবে বৃদ্ধ সাঁওতালটি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, হাতের টাঙ্গির এক ঘায়ে সেপাইটাকে কেটে ফেলল।” (১৭)

এই হত্যা অভিযানের পরেও আগস্ট মাসের মাঝামাঝির হিসাব থেকে দেখা যায় সশস্ত্র সাঁওতালের সংখ্যা তখনও “ত্রিশ হাজারের বেশি।” এদের মধ্যে অনেকে তখন মুঙ্গের জেলার “মুলহিয়াপুর

(১৭) বিশেষভাবে 'দি সানতাল ইনসারেকশন' (দত্ত) নামক বই থেকে অধিকাংশ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা উধৃত করা হয়েছে।

গ্রামে প্রবেশ করছিল। সরকারী অভিযানের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ১১ই আগস্ট তারিখে ভাগলপুরের কমিশনার মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টাকারকে লেখেন, ‘এখনও তারা পরাজয় স্বীকারের কোন লক্ষণই দেখাচ্ছে না; বরং এখনও তারা খোলাখুলিভাবেই আমাদের সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে’।”

সাঁওতালদের দমন করবার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই বাদ দেওয়া হয়নি। তবুও আগস্ট মাসে নদীয়া বিভাগের কমিশনার বিডওয়েল সাহেবকে নিয়োগ করা হয় স্পেশাল কমিশনার হিসাবে—“কৃষক অভ্যুত্থানকে সাময়িক ভাবে দমন করবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থাদি কার্যে পরিণত করতে।”

অবিচলিত নিষ্ঠা ও মৃত্যুভয়হীন শৌর্যবীর্য সত্ত্বেও সাঁওতাল সংগ্রামের ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভারতের বাকি অংশ ছিল শান্ত, নিস্তরঙ্গ; বিশাল সাম্রাজ্যের বিরাট সামরিক শক্তি সংহত করা হল সংগ্রামী সাঁওতালদের বিরুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যের সংখ্যা লক্ষের কোঠা পার হয়ে গেল। “কোন কোন সৈন্যঘাঁটিতে ১২ থেকে ১৪ হাজার পর্যন্ত সৈন্যকে সমাবেশ করতে হয়েছিল বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করবার জন্য।”

এই নৃশংস দমন-পীড়নের ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদের স্তাবকেরা অবশ্য সাঁওতালদের “অমানুষিক নিষ্ঠুরতাই” দেখতে পেয়েছিল। তাই সাঁওতালদের বিরুদ্ধে সব রকমের ব্যবস্থাই তারা সোৎসাহে সমর্থন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের এই স্তাবকদের মধ্যে একজন হলেন ওম্যালি সাহেব। তিনি লিখেছেন,

“অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় এরা এদের পারদর্শিতা দেখাল। যদি কোন মহাজন এদের হাতে পড়ত, তা’ হলে প্রথমে তারা তার দুটি পায়ের পাতা কেটে ফেলত; ঠাট্টা করে মন্তব্য করত টাকায় চার আনা শোধ

হল। তার পরে তার দুখানা পা কেটে ফেলে আরও চার আনা অর্থাৎ মোট আট আনা শোধ করা হত। তারপর ধড়টিকে দুভাগ করে কেটে ফেলা হত। এই ভাবে বার আনা পূরণ করা হত। সব শেষে মুণ্ডটি কেটে ফেলে ষোল আনায় ষোল আনা অর্থাৎ তামাম শোধ দেওয়া হত।" (১৮)

জমিদার মহাজনের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুগসঞ্চিত আক্রোশের এই বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করুন সরকারী পাশবিকতার। এই অভ্যুত্থান দমনে সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, ব্যালফোর সংকলিত 'ভারতের বিশ্বকোষে' তা বর্ণনা করার ভান করা হয়েছে। এই বর্ণনায় সরকারের পৈশাচিক তাণ্ডবকে অবিশ্বাস্য রকমে ছোট করে দেখান হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনাতেও যতটুকু ধরা পড়েছে তা এই :

> "রক্তপাত না করে বিদ্রোহ দমন করা হয় নি।" তার পরে অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে বলা হয়েছে, "বাস্তবিক পক্ষে বিদ্রোহীদের শতকরা পঞ্চাশজন মারা পড়ে।" (১৯)

অর্থাৎ ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতালের মধ্যে পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার জনকেই খুন করা হয়েছিল। জুলাই আর আগস্ট মাসের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে রাজমহল পাহাড় রঞ্জিত হয়েছিল সাঁওতাল বীরদের উষ্ণ শোণিতে।

১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জামাত্রার উত্তর-পূর্বে ওপারবান্ধোর কাছাকাছি কানহু এবং অন্যান্য নেতারা বন্দী এবং নিহত হন। কিন্তু ২০।২৫ হাজার সাঁওতাল কৃষকের রক্তেও রক্তপায়ী সাম্রাজ্যবাদীদের রক্ততৃষ্ণা তৃপ্ত হল না। 'ফ্রেণ্ড্‌স্ অব ইণ্ডিয়া'

১৮। ও'ম্যালি, 'বেঙ্গল, বিহার এ্যাণ্ড উড়িষ্যা', পৃঃ ১৯৩-৪

১৯। ব্যালফোরের এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৫২৭

এবং ‘ক্যালকাটা রিভিউ’এর সম্পাদক-চূড়ামণিরা দাবি জানালো যারা বেঁচে আছে তাদেরও দারুণ ভাবে সাজা দেওয়া হক। ‘ফ্রেণ্ডস্ অব ইণ্ডিয়া’র সম্পাদকটি লিখলেন, “রক্তপিপাসু এই বন্যরা বাল-বৃদ্ধ বা নারী-পুরুষ কোন বাছবিচার করেনি। এই বন্যদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেই কেবল আমরা এই বিদ্রোহ দমন করতে পারি। এদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। সমতলের চাষীদের এদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে (অহো!)। সাঁওতালদের ধারণা, রক্ত আর লুণ্ঠনের তাণ্ডবে গা ঢেলে দিলেও মাসখানেকের মধ্যে প্রতিশোধের কোন সম্ভাবনা নেই। এই ধারণা যাতে দূর করা যায়, মুছে ফেলা যায়, তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার ;—নইলে এসমস্ত অঞ্চলে সরকারকে সব সময়েই সঙ্গীন উঁচিয়ে থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রতিশোধের অভিযানকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে ; ভবিষ্যতের হাঙ্গামাকারীদের জন্য কোন সুযোগই রাখা চলবে না। প্রতিশোধের এই অভিযানকে করে তুলতে হবে এমন ভয়াবহ যেন সবাই তার অর্থ, তার মর্ম উপলব্ধি করে ; করে তুলতে হবে এমন প্রচণ্ড যে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে তাদের জীবন ও সম্পত্তিকে সরকার হাল্কা ভাবে দেখে না। দু একজন বাঘা বাঘা নেতাকে কেবল নয়, যে যে অঞ্চলে এই বিদ্রোহের ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে, সে সে অঞ্চলের সমগ্র জনসংখ্যাকেই আমাদের দেশান্তরিত করা উচিত পেগুতে। যে রকম উপেক্ষাভরে ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীসভা চার্টিস্টদের দঙ্গলটিকে ক্ষমা করেছিল কিম্বা আইরিশ দেশপ্রেমিকদের ক্ষুদ্র চক্রটিকে নির্বাসিত করেছিল, সে রকম মেজাজে সশস্ত্র বিদ্রোহ সহ্য করবার অবস্থা ভারতে নেই। ১৮২৮ সালে ক্যানাডায় যেমন করা হয়েছিল, ঠিক তেমন ভাবে সাঁওতালদের দণ্ডদানের দায়িত্বও ছেড়ে দিতে হবে একটি বিশেষ কমিশনের হাতে। আর যদি

খামখেয়ালী বলে এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করা হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপর জরিমানা ধার্য করতে হবে। যে পরিমাণ ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে, জরিমানার পরিমাণ হবে তার সমান ; পরে জরিমানা হিসাবে প্রাপ্ত এই টাকা লুণ্ঠিতদের মধ্যে বেঁটে দিতে হবে। এই বিদ্রোহী নরগোষ্ঠীর দণ্ডদানের জন্য, বৃটিশ মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য সাঁওতালদের সাজা দিতে হবে পাইকারী হারে।"

সাঁওতালদের নিপীড়িত আত্মা ব্যাকুলকণ্ঠে দাবি করেছিল শান্তি, দাবি করেছিল অত্যাচারীদের কবল থেকে আশ্রয়। সাম্রাজ্যবাদীরা জবাব দিল, আরও রক্ত দাও, আরও শাস্তি নাও, আরও উচ্ছন্নে যাও।

শত শত সাঁওতাল কৃষককে আটক করা হল বন্দী হিসাবে, জামীন হিসাবে। শ্রীযুক্ত দত্তের বইতে পাওয়া যায়, "সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনারের রেকর্ড অফিসে সাঁওতাল বন্দীদের মামলা সংক্রান্ত নথিপত্রের দুটি বৃহদাকার ফাইল রয়েছে।" (২০) এই সমস্ত কাগজপত্র এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। এদের মধ্যে মোট কতজনকে বিচার করা হয়েছিল, কার উপর কঠোর শাস্তি বিধান করা হয়েছিল, তা আমরা জানি না। যাই হোক এই ফাইলগুলি থেকে একটা অংশ লোকচক্ষুর গোচরে এসেছে। তা থেকে দেখা যায় সাঁওতাল পরগণার কমিশনার একসঙ্গে ৫২টি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ২৫৩ জন বন্দীর বিচার করেছিলেন। এদের মধ্যে দুজন বিচার চলা-কালে রাজসাক্ষী হয়, আর ছাড়া পায় তিন জন। এই ২৪৮ জন বন্দীর মধ্যে ৯ থেকে ১০ বছরের বালক ছিল ৪৬টি। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী "স্কুলের শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তির মত এদের বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়।" বাকিদের ৭ থেকে ১৪ বছরের দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২০। দত্ত, 'দি সানতাল ইত্যাদি', পৃঃ ৬৭-৬৮

বন্দীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল,—এ থেকেই বোঝা যায় কী সুবিপুল গণ-সমর্থন তাদের পেছনে ছিল। বাংলার ছোটলাটের কাছে এক পত্রে বিডওয়েল সাহেব জানান, "দ্রুত বিচার সমাধা" করার ব্যাপারে তিনিও আগ্রহশীল, কিন্তু "সাক্ষী সংগ্রহের ব্যাপারে" খুবই বেগ পেতে হচ্ছে।

মহান সাঁওতাল অভ্যুত্থানকে এইভাবে দমন করা হল—নির্মম নিষ্পেষণ আর নির্বিচার বিচার-প্রহসনের মাধ্যমে। কিন্তু এর আহ্বান ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকল যুগ যুগ ধরে। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুনের সূর্যগর্ভ রাত্রিতে ভাগনদীঘির সাঁওতাল কৃষকরা যে আহ্বান ধ্বনিত করেছিল তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল ১৮৬০ সালের নীল ধর্মঘটে, ১৮৭২ সালের পাবনা ও বগুড়ার অভ্যুত্থানে, ১৮৭৫-৭৬ সালে পুণা ও আমেদনগরে মারাঠী কৃষকদের বিদ্রোহে। এই বিদ্রোহ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সমগ্র ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত, শুরু হল জমিদারী ও মহাজনী উচ্ছেদের দেশজোড়া আন্দোলন। সাঁওতাল কৃষকদের রক্ত বৃথাই ব্যয় হয়নি।

মৃত্যুহীন সাঁওতাল শহীদদের সালাম। তোমরাই প্রথম তুলে ধরেছিলে গণ-সংগ্রামের নিশান। সেই নিশানই আজ গোটা দেশ জুড়ে কোটি কোটি হাতে জল জল করছে বিরতিবিহীন সংগ্রামের শোণিত-রঞ্জিত অঙ্গীকারের নিশানা হিসাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নীলচাষীদের ধর্মঘট—১৮৬০

"লাভ হোক আর লোকসান হোক, প্রাণ থাকতে আমি নীল চাষ করব না। না, কারুর জন্যে, কোন কারণেই আমি নীল চাষ করব না।"

নীল কমিশনের সম্মুখে দামহুদা থানার দালালনগর কারখানার মজুমপুরের দীনু মণ্ডলের উক্তি। (সাক্ষ্যবিবরণী)

কলকারখানায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল তৈরী হবার শত শত বছর আগে থেকেই ভারতের চাষীরা সূতী কাপড়ে নীল রং দেবার জন্য একরকমের উদ্ভিদ্‌ উৎপাদন করে আসছিল—এই উদ্ভিদের নামই নীল। আঠারো শতকের শেষভাগে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে গ্রেটবৃটেনে বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড়চোপড়ে রং দেবার জন্য এই নীলের চাহিদা বিপুলভাবে বেড়ে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও নীল ব্যবসাকে লুফে নিল, উঁচুহারে মুনাফা কামাবার লোভনীয় উৎস হিসাবে। যাই হোক ভারতে নীলচাষ তখনও এতটা ব্যাপক হয়ে ওঠেনি যে গ্রেটবৃটেনের ক্রমবর্ধমান বস্ত্রশিল্পের বিরাট চাহিদা তা থেকে মিটতে পারে। সুযোগ বুঝে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আর তরুণ ভূঁইফোঁড়েরা—যারা কিছুদিন আগেও মার্কিন মুলুকে দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, তারা—বিহারে এবং বাংলায় স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে জমির বন্দোবস্ত নিল এবং সেই জমিতে বাগিচাশিল্প হিসাবে ব্যাপক হারে নীলের চাষ শুরু করে দিল। প্রজাদের জোরজবরদস্তি করে নীল উৎপাদন করতে বাধ্য করা হল।

এই ধরনের ভূমিদাসত্বের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদ এত বিরাট আকার ধারণ করে যে সেই দূর অতীতেই—১৮১০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখেই—সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর একটা ফতোয়া জারি করতে বাধ্য হন:

যে সব ইউরোপীয় "এই দেশের বিভিন্ন অংশে নীলকর হিসাবে কায়েম রয়েছেন তাঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনাচার ও অত্যাচারের প্রতি সম্প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।...... এই শ্রেণীর কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সমস্ত ঘটনা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সুপ্রিম কোর্ট অব জুডিকেচার-এর সমক্ষে সপ্রমাণ হয়েছে, সেগুলি এত জাজ্বল্যমান যে সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর মনে করেন যে, ইংরেজ-চরিত্র এবং এ দেশীয় প্রজাদের শান্তি ও সুখের পক্ষে সমভাবে হানিকর এই ধরনের অপরাধের যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবস্থাদি অবলম্বন করা তাদের একান্ত কর্তব্য।" (১)

এই ফতোয়ায় নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উল্লিখিত হয় তা' সাংঘাতিক। যথা--

"[১] হিংস্র ক্রিয়াকলাপ—যেগুলিকে আইনগতভাবে হত্যাকাণ্ড বলা না গেলেও—যেগুলির ফলে এদেশীয়দের মৃত্যু ঘটেছে ;

"[২] বকেয়া টাকা উদ্ধারের অজুহাতে বা অন্য কোন অছিলায় এ-দেশীয়দের বে-আইনীভাবে আটক করে রাখা—বিশেষ করে খোঁয়াড়ের মধ্যে ;

"[৩] নিজ নিজ কারখানার এবং অন্যান্য জায়গার লোকজনকে হৈ হুল্লোড় করে জড়ো করা এবং অপরাপর নীলকরদের সঙ্গে সহিংস দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়া ;

"[৪] কৃষক ও অন্যান্য লোকজনকে বেত্রাঘাত ও অন্যান্য পদ্ধতিতে বে-আইনীভাবে শাস্তি দান করা।"

নীলকর সাহেবদের অনাচার-অত্যাচার সম্পর্কে বিদেশী সরকারের

(১) ইণ্ডিগো কালটিভেশন ইন বেঙ্গল, পার্লিয়ামেণ্টারি পেপারস্, ১৮৬১। ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৭০-৭১।

এই উৎকণ্ঠার কারণ কি? কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট; একদিকে ভারতের বুকে মারাঠা, টিপু এবং ফরাসীদের সঙ্গে আর অপর দিকে ইউরোপে নেপোলিয়নের সঙ্গে ভয়াবহ সংগ্রাম—এই দুয়ের মধ্যে পড়ে লর্ড মিণ্টো তথা ইংরেজ শাসকশক্তি স্বভাবতই চাইল গুরুতর রকমের কোন গণ-বিক্ষোভ এড়াতে।

যাই হোক উপরের ঐ ঘোষণা যে নেহাৎই একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, তা কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল;—নীলকর সাহেবদের কুঠিয়ালদের অত্যাচার বন্ধ বা হ্রাস করবার কোন্ ব্যবস্থাই করা হল না। ফলে পরবর্তী চল্লিশ বছরে ইউরোপীয়রা এখানে সেখানে একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করল; তাদের জমিদারী বন্দোবস্তের এলাকাও সম্প্রসারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে চলল।

নীলকর সাহেবদের কাছে নীলের ব্যবসা ছিল বেজায় লাভজনক। কিন্তু যেসব শর্তে কৃষকরা এই নীল উৎপাদন করতে বাধ্য হত, তাতে তাদের বরাতে জুটত কেবল লোকসান আর লোকসান। স্বভাবতই কৃষকরা স্বেচ্ছায় নীলচাষ করতে রাজি হত না। কিন্তু রাজি না হলে তো চলবে না; অন্য ফসলের উৎপাদন বন্ধ করিয়ে তাকে দিয়ে জোর-জবরদস্তি করে নীল উৎপাদন করানো হত। নীল কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে বাংলার ছোটলাট পর্যন্ত স্বীকার না করে পারেননি যে,

> "নীলের জন্য চাষী যদি উচ্চতম মূল্যও পেয়ে থাকে তা হলেও তাকে যে নীট লোকসান দিতে হয়—তা যদি হিসাব করা যায় আর সেই সঙ্গে যদি হিসাব করা যায় নীলের বদলে অন্য কোন ফসল ফলালে যে মুনাফা হত সে মুনাফা হারাবার লোকসান, তাহলে কোনক্রমেই নীলচাষের ফলে চাষীর গড়পরতা নিছক

নীট লোকসানের পরিমাণ বিঘাপ্রতি ন্যূনপক্ষে ৭৲ টাকার অর্থাৎ বিঘাপ্রতি খাজনার ৭ গুণের কম হবে না। সমস্ত রকমের চরম দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করে এবং সমস্ত রকমের সন্দেহের অবকাশ নীলচাষের স্বপক্ষে ধরেই এই হিসাব করা হয়েছে।" (২)

খুবই স্বাভাবিক যে এই লোকসানের ব্যবসা করতে কোন চাষীই স্বেচ্ছায় রাজি হতে পারে না। তাই জোরজবরদস্তি করেই নীলকর কুঠীয়ালরা তাদের নীলের আবাদ করাতে বাধ্য করল। কি ধরনের অত্যাচার তারা চালাত তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৫৪ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে নদীয়ার জজ সাহেব স্কোন্‌স্ কর্তৃক বাংলা সরকারের সেক্রেটারীর কাছে লেখা একখানা পত্রে। উক্ত পত্র থেকে জানা যায় যে নীলকর সাহেবদের মর্জি অনুযায়ী চাষীদের অন্যান্য ফসল না ফলিয়ে নীলের আবাদ করতে হত; প্রতি আড়াই বিঘা জমিকে নীলকর সাহেবরা এক বিঘা বলে গণ্য করত, দুটি নীলের বাণ্ডিলকে একটি বাণ্ডিল বলে নিয়ে যেত; প্রজাদের শস্যাদি বেপরোয়াভাবে ধ্বংস করা হত; তাদের বাড়ীঘরে লুঠতরাজ চালানো হত, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হত; তাদের গরুবাছুর লুণ্ঠন করা হত বা ডুবিয়ে দেওয়া হত। এই পাশবিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভে নদীয়ার জেলা জজ স্কোন্‌স্ সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি অনুরোধ জানালেন, নীলচাষের সমগ্র ব্যবস্থা সম্পর্কেই সরকার একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করুন। (৩) বলা বাহুল্য, তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা দরকার, ১৮৫৫-৬৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা তখনও সরকারের হয়নি।

এদিকে নীলকর সাহেবদের অনাচার-অত্যাচার বেড়েই চলল।

---

(২) ঐ, পৃঃ ৭৭।

(৩) ঐ, পৃঃ ৬-৭।

গ্রামের পর গ্রাম থেকে, জেলার পর জেলা থেকে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে চিঠি আসতে লাগল। ১৮৬০ সালের ১৬ই জানুয়ারী নদীয়ার অধিবাসীরা বাংলার ছোটলাটের কাছে যে আবেদন পাঠান, দৃষ্টান্ত হিসাবে তার অংশবিশেষ উধৃত করা হচ্ছে :—

> "২৮শে অক্টোবর (১৮৫৯) তারিখে আমাদের এই গ্রামের অধিবাসী বোরু মণ্ডল ও চন্দ্রবিশ্বাসকে নীলকুঠীর সশস্ত্র লোকজন এসে ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তাদের আর কোনও খবরাখবর পাওয়া যায়নি।......সরেজমিন তদন্তের ফলে সত্য বলে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অভিযোগ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই অজুহাতে খারিজ করে দিয়েছেন যে এই ধরনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার তাঁর নেই। ন্যায় বিচারের জন্য আমাদের এই উদ্যোগ নীলকর সাহেবদের দারুণ ক্রোধের কারণ হয়েছে ; ২রা নবেম্বর তারা গোবিন্দপুরের আনন্দ সর্দারকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। পরে আবার ৮ই নবেম্বর তারিখে সোনাপুকুরিয়ার উজুল মোল্লা ও পতন শেখকে ধরে নিয়ে গিয়েছে ; সোনাপুকুরিয়ার আরও ৬ জন চাষীও অপহৃত হয়েছে।" (৪)

নীলকর দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃত এই সব চাষীদের নাম থেকেই বোঝা যায় যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই একযোগে দাঁড়িয়েছিল এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

কিছুদিন আগে যারা আমেরিকায় দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, তারাই আবার ভারতে এসে হল নীলকর সাহেব। অত্যাচারের যে তাণ্ডব তারা সেখানে এত দিন চালিয়ে এসেছে, তাই আবার তারা নতুন করে এখানে শুরু করল।

বাংলা সরকারের সেক্রেটারীর কাছে নদীয়া বিভাগের কমিশনার

---

(৪) পার্লামেণ্টারি পেপারস্, ৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৭১-২।

মিঃ গ্রোট যে তৃতীয় সপ্তাহান্তিক রিপোর্ট (১০-১৭ই মার্চ্চ, ১৮৬০) পাঠান তা থেকে কৃষক সমাজের তৎকালীন মনোভাব আঁচ করা যায়। উক্ত রিপোর্টে তিনি লেখেন,

"আমি এই সপ্তাহে দামুরহুদা মহকুমা পরিদর্শন করেছি। সাধারণ ভাবে আমার ধারণা যে এখানকার চাষীরা নীল চাষ না করবার জন্য অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখানে আন্দোলন ঢের বেশি শক্তিশালী এবং সংগঠিত।" (৫)

এই হল ভারতীয় কৃষক সমাজের একটি অংশ কর্তৃক সংগঠিত ভারতের প্রথম ধর্মঘটের সংকেত। তাদের সংকল্প, তাদের সংগঠন একজন কমিশনারের মনে পর্যন্ত রেখাপাত করেছিল।

নীলের এক্তিয়ার-ভুক্ত জেলাগুলিতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নদীয়া, বারাসত এবং পাবনায় কৃষকদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের স্তরে উন্নীত হল। ব্যাপক ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে কৃষকরা গণসংগ্রামের পথে পা বাড়াল। ১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসে বারাসত মহকুমার সমগ্র কৃষকসমাজ এক সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হল। ভারতের কৃষকসমাজের ইতিহাসে এটাই বোধহয় প্রথম সাধারণ ধর্মঘট। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটী কৃষকেরা আওয়াজ তুলল এবং নীল বপন করতে অস্বীকৃতি জানাল। নীলকর সাহেবরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সচিব স্যার চার্লস্ উড্-এর কাছে এক স্মারক পত্রে 'বৃটিশ-ভারতের জমিদার ও বণিক সমিতির' সভাপতি ডি, ম্যাকিনটি জানান,

"মফস্বল অঞ্চল আজ ষোল আনা বিশৃংখলার মধ্যে। দেনা ও চুক্তি অস্বীকার করেই দেনাদারেরা ক্ষান্ত নয়, তারা দেনাদার ও নিয়োগ-কারীদের দেশছাড়া করবার জন্য দল বেঁধেছে। এইভাবে তারা এই

(৫) ঐঃ পৃ, ২৪১

প্রদেশের সমস্ত ইউরোপীয়দের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে, যে-সম্পত্তি তারা করতলগত করেছে তা দখলে রাখতে, এবং ইউরোপীয়দের কাছে তাদের সমস্ত দায় ও দেনা খারিজ করে দিতে চায়।” (৬)

১৮৬০ সালের ১০ই এপ্রিল দু’নম্বর বেঙ্গল পুলিশ ব্যাটালিয়নের নায়ক হাবিলদার শিবু খাঁ পাবনা জেলার নিশানপুর নীলকুঠিতে উপস্থিত ছিলেন। যে সমস্ত ঘটনা সেখানে ঘটে সে সম্পর্কে তিনি লেখেন,

“ভোর বেলাতেই আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। পীরারি নামে এক গ্রামে আমরা মার্চ করে গেলাম। সেখানে প্রায় ২০০০ লোক আমাদের ঘিরে ফেলল। তাদের হাতে হাতে বর্শা, ধনুক আর লাঠি। তারা এগিয়ে এল, এগিয়ে এসে বর্শার ঘায়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘোড়াটিকে জখম করল। জানা গেল, ৫২টি গ্রাম থেকে এই সব মানুষ জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি লোক সকলেরই চোখে পড়েছিল। সে দিক থেকে কিছু গুলিগোলার আওয়াজ এল।”(৭)

এই পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে কেবল ধর্মঘট করেই কৃষকরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিল না। ৫২টি আলাদা আলাদা গ্রামের ২০০০ মানুষ সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে একটি স্থানে সামিল হয়েছে—এই একটি মাত্র ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় কী সুদৃঢ় সংগ্রামী ঐক্য ও সংগঠন তারা গড়ে তুলতে পেরেছিল।

ভারতের কৃষক সমাজের ইতিহাসে এ ঘটনা অভূতপূর্ব—স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। পাবনা ও নদীয়া জেলার এবং বারাসত মহকুমার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কৃষকসমাজ ভারতের কৃষক ইতিহাসের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করল। সেই ধর্মঘট দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল প্রায় সারা বাংলা দেশে—যশোর, খুলনা, রাজসাহী, ঢাকা, মালদা

---

(৬) পার্লিয়ামেণ্টারি পেপারস (১৮৫১) ; ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৫-৬।

(৭) পার্লিয়ামেণ্টারি পেপারস্ (১৮৬১), ৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৯।

এবং দিনাজপুরে। ভারতে শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হবারও আগে, গান্ধীজির জন্মগ্রহণেরও আগে এই সব জেলার কৃষকেরা ধর্মঘটের পথে পা বাড়াল। দূর দূর বিস্তৃত, ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কৃষক সমাজের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম থেকেই বোঝা যায় কী বিশাল গণ-সমর্থন তাদের পেছনে ছিল। যে বিরাট এলাকা জুড়ে এই সংগ্রাম ব্যাপ্তি লাভ করেছিল, যে বিপুল সংখ্যক কৃষক এই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল তা যদি আমরা হিসাব করি, তা হলে দেখা যায় গান্ধীজি পরিচালিত চম্পারণ, কয়রা এবং বারদৌলি আন্দোলনও তার কাছে হার মানে।

ইতস্তত বিচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা নীলকর সাহেবদের ইতিপূর্বে অনেকবার ঘটেছে। সেই বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ দমন করবার নিজস্ব পাশবিক কায়দাও তাদের ছিল। আর এই কায়দায় তারা হাত পাকিয়েছিল যুগ যুগ ধরে। কিন্তু এমন ব্যাপক ভিত্তিতে সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে এর আগে আর কখনও তাদের পড়তে হয়নি। তাই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যেপে বিশাল কৃষকসমাজের এই সংগঠিত প্রতিরোধ-সংগ্রামের মুখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বাংলা সরকারের সেক্রেটারীকে সতর্ক করে নীলকর সমিতির তৎকালীন সাময়িক সম্পাদক এ, আর, ইয়ং লেখেন,

> "সমগ্র নিম্নবঙ্গ জুড়ে সামগ্রিক অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী—অবশ্য সরকার যদি অবিলম্বে এই অভ্যুত্থান দমনে কঠোর ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করে।" নীলকর সাহেবরা এতদিন ভরসা ক'রে এসেছিল তাদের পশুশক্তির উপরে, কিন্তু এবারে তারা সে ভরসা হারিয়ে ফেলল। মিঃ ইয়ং লেখেন, "সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে এই অসন্তোষকে শান্ত করা নীলকর সাহেবদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে।" (৮)

---

(৮) ঐ পৃঃ ১৯৫।

বিক্ষুব্ধ কৃষকদের রোষবহ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য এ হল সরকারের কাছে ইংরেজ নীলকরদের আকুল আবেদন। কিন্তু কৃষক বিক্ষোভের এই সংগঠিত অভিযানের বিরুদ্ধে তাড়াহুড়ো করে সৈন্য পাঠাতে সরকার ইতস্তত করল। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে মাত্র চার বছর পার হয়েছে, তার স্মৃতি তখন তাদের মনে জ্বল জ্বল করছিল। ১৮৪৭ সালে কৃষক বিদ্রোহের পেছনে যে ব্যাপক গণসমর্থন আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাও তারা ভুলে যায়নি।

অন্যান্য কারণও অবশ্য ছিল। নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচার এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে তার স্বপক্ষে সাফাই দেওয়াও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এদিকে শহরে ও গ্রামে সমাজের অন্যান্য অংশের সমর্থনও নীল-চাষীদের পক্ষে দানা বাঁধছিল। অনেক মিশনারি সাহেবের সহানুভূতিও তারা আকর্ষণ করছিল। হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি, গিরিশচন্দ্র বসু, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশির কুমার ঘোষ এবং আরও অনেক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নীলচাষীদের অভাব অভিযোগ, দাবি-দাওয়া প্রভৃতি স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে ভাষা দিতে লাগলেন। মোল্লাহাটিতে নীলকর সাহেবরা যে অকথ্য অত্যাচার চালায় তার চিত্র উদ্ঘাটন করে দীনবন্ধু মিত্র "নীল দর্পণ" নামে একখানা অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক লেখেন।

নীল চাষীদের পেছনে জনসমর্থন এত বিশাল আকার ধারণ করে যে কয়েকজন মিশনারি সাহেব পর্যন্ত তাঁদের সহানুভূতি জানাতে এগিয়ে আসেন। এই সব মিশনারি সাহেবের মধ্যে রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্‌ অন্যতম। নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচার সম্পর্কে তিনি একখানা পুস্তিকা লেখেন। এই পুস্তিকায় কৃষকদের দাবিদাওয়া সমর্থন করা হয়। এই পুস্তিকাখানা বহুলভাবে প্রচারিত হয়। (৯)

---

(৯) অভয় চরণ দাস তাঁর "দি ইণ্ডিয়ান রায়ত" (কলিকাতা, ১৮৮১) নামক

সরকারকে সংযত রাখতে এই সমস্ত কারণের কিছু কিছু ভূমিকা ছিল সত্য, কিন্তু যে কারণটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তা হল সরকারের ভয়—মহান সাঁওতাল বিদ্রোহের পুনরনুষ্ঠানের ভয়। একটি গণঅভ্যুত্থান কি ভাবে আর একটি গণঅভ্যুত্থানের গতিপথে প্রভাব বিস্তার করে, এই ঘটনা তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। সাধারণ ধর্মঘট ভাঙবার জন্য সৈন্যবাহিনী না পাঠিয়ে সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল; এই কমিশনের কাজ হবে নীলচাষের সমগ্র ব্যবস্থাটি তদন্ত করা।

সরকার যে বেদম ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বাংলার ছোট লাট জে, পি, গ্রাণ্টকে পর্যন্ত তা স্বীকার করতে হয়েছিল। নীল কমিশনের সমক্ষে তাঁর পত্রে এই ভয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত হয়। কৃষকদের শক্ত হাতে দমন করবার জন্য সরকার আরও জোরজবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করছে না কেন—সমালোচকদের এই সমালোচনার উত্তরে তিনি লেখেন।

"শত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এই যে প্রকাশ—যে বিক্ষোভ আমরা বাংলা দেশে প্রত্যক্ষ করছি—তাকে কেবল মাত্র একটা রং-

---

বইয়ের ২৯৪-৫ পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। উক্ত পুস্তিকায় অনেক গান উধৃত করা হয়েছে; এই সব গান চাষীরা বিভিন্ন অঞ্চলে গাইত। একটি গানের ভাবার্থ নিম্নরূপ—নীলকর সাহেবের আগাম টাকার সুদ জমে তিন পুরুষ ধরে। সাহেব যখন প্রথম আসে, সে আসে ভিখারীর মত। কিন্তু অবশেষে তারই কল্যাণে দুর্বা গজায় রায়তের হাড়ে। নীলকর সাহেব সূঁচ হয়ে ঢোকে আর ফাল হয়ে বেরোয়। পঙ্গপালের মত তারা বাংলার ক্ষেতখামার উৎসন্নে দিল। প্রজারা যায় রসাতলে কিন্তু রাজা সেদিকে ফিরেও তাকায়না। সবই যখন গেল, তখন ভগবানের কাছে ছাড়া আমরা কাকেই বা জানাবো? রাতে যখন চোখ বুজি, তখনও শাদা শাদা সব মুখ চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়ে যায়—পাখীর মত। যন্ত্রণার দহনে আমাদের হৃদয় অনুক্ষণ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

সংক্রান্ত মামুলি বাণিজ্যিক প্রশ্ন ছাড়া গভীরতর গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যা বলে যে ব্যক্তি মনে করছেন না, আমার মতে সময়ের ইঙ্গিত অনুধাবন করতে তিনি মারাত্মকভাবে ভুল করছেন।" (১০)

অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন,

"আইনের বিপক্ষে, নীলচাষের স্বপক্ষে লৌকিক কোন শক্তিই আর বেশি দিন এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেনা। ন্যায়-বিচার উপেক্ষা করে সরকার যদি এমন কোন নীতি অনুসরণের চেষ্টা করত, তা হলে এক বিরাট কৃষক অভ্যুত্থান তড়িৎগতিতে এই চেষ্টার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তিবিধান করত। আর এই কৃষক অভ্যুত্থান ইউরোপীয় ও অন্যান্য পুঁজির পক্ষে যে-সাংঘাতিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনত, তা মানুষের হিসাবের বাইরে।" (১১)

ছোটলাটের এই কথাগুলি নিশ্চয়ই অর্থপূর্ণ। পদ্মা নদীর শাখা গড়ুই নদীতে স্টীমারে করে সফর করবার সময় তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন এই কৃষক প্রতিরোধের ব্যাপকতা কী বিরাট। কৃষকরা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা তাঁর গাত্রস্পর্শ করবে না ; তখন তিনি তাঁর স্টীমার পারে ভিড়াবার হুকুম করলেন। সেখানে তিনি কৃষক নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেন যে তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারার্থে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা সরকারের ছিল। তাই কৃষক-সমাজের এই সুদৃঢ় ঐক্য, এই অদম্য সংকল্পের মুখে সরকার বাধ্য হল একটি ঘোষণাপত্র জারি করতে। এই ঘোষণাপত্র জারি হল বারাসতের

---

(১০) পার্লিয়ামেণ্টারি পেপার্স্ ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

(১১) ঐ ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় এ্যাশলি ইডেনের কাজ থেকে কালাওয়া মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হেমচন্দ্র করের কাছে প্রেরিত নির্দেশাবলীর আকারে। এই ঘোষণাপত্র বাংলা ভাষাতেও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ঘোষণাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

"আপনি দেখবেন, নীল সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদে পুলিশের কাজ হল রায়তকে রক্ষা করা—যাতে করে তার অধিকারাধীন জমিতে সে নীলকর বা অপর কারও মর্জিমাফিক ফসল উৎপাদন করতে বাধ্য না হয়ে নিজের খুশিমত ফসল উৎপাদন করতে পারে। রায়ত তাকে নীল উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এই অজুহাতে রায়তের জমিতে বলপূর্বক প্রবেশের অধিকার নীলকরদের নেই। এই ধরনের প্রতিশ্রুতি কেবলমাত্র দেওয়ানী আদালতে বিচারার্থে হাজির করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন কিছু করবার এক্তিয়ার নেই ; কারণ প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতির ব্যাপারেই দুটি পক্ষের উপস্থিতি অপরিহার্য। এরূপ হওয়া সম্ভব যে প্রতিশ্রুতি দেবার পরেও, কিম্বা চুক্তিবদ্ধ হবার পরেও, নীলকরদের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই পাবার মত অকাট্য যুক্তি রায়তের থাকতে পারে।" (১২)

এই ঘোষণাপত্র আসলে নীলচাষীদের বিজয়লাভেরই প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি। নীলচাষীদের ধর্মঘটের ফলে বিহার এবং উত্তর প্রদেশের অনেক জেলা থেকে নীল চাষ উঠে যায়।

নীলকরদের বাণিজ্যিক স্বার্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারতে বৃটিশ রাজত্বের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই তার চাইতে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

নীল কমিশনের তদন্ত এ বিষয়টির উপর প্রচুর আলোকপাত করে। যে সমস্ত নীলচাষীকে কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল,

(১২) ঐ ৪৫শ খণ্ড ; পৃঃ ৪।

তাদের সংকল্প ও দৃঢ়তা সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্ট থেকে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি উধৃত করা হল :

"এই বিশেষ ধরনের চাষের প্রতি বিরূপ মনোভাব এত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এত দৃঢ়মূল বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল যে কৃষকদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ভ্রান্ত কোন ধারণা সৃষ্টি হবার কোন অবকাশই ছিলনা। আমাদের মত যাঁরা রায়তদের মেজাজ প্রত্যক্ষ করেছেন কিম্বা তাঁদের ভাষা শ্রবণ করেছেন তাঁরা ছাড়া এই বিরূপ মনোভাবের তীব্রতা অন্যান্যদের পক্ষে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা অসাধ্য। বিভিন্ন নীলকুঠির সঙ্গে যুক্ত, দূর দূর অঞ্চল থেকে আগত রায়তেরা একই মনোভাব একই রকম স্পষ্ট, জোরালো, তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করেছে। সে মনোভাব হল এই যে, নীল এবং তার আনুষঙ্গিক অভিশাপগুলিই তাদের সকল দুর্দশার মূলে।" (১৩)

নীলচাষীদের দৃঢ়তা, সংহতি ও সাহসের প্রতি কী মহান অর্ঘ—বিশেষ করে যখন এই অর্ঘ এসেছে বৃটিশ সরকারের নিয়োজিত কমিশনের তরফ থেকে।

সাক্ষীর পরে সাক্ষী নীল-কমিশনের সম্মুখে এসে হাজির হয়। অবিচল কণ্ঠে জ্বালাময়ী ভাষায় নীলচাষ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের তীব্র ঘৃণা তারা ব্যক্ত করে। কমিশন তাদের কাছ থেকে জানতে চান কোন্ কোন্ শর্তে তারা ভবিষ্যতে নীল চাষ করতে রাজি হবে। দামুহুদা থানার দালালনগর কারখানার মজুমপুরের দীনু মণ্ডল জেরার জবাবে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, "লাভ হোক আর লোকসান হোক, প্রাণ থাকতেও আমি কিছুতেই নীল চাষ করবনা।" কিন্তু ধর, নীলকররা যদি সাহেব না হয়ে বাঙ্গালী হয়? "না, কারুর জন্য কোন কারণেই আমি নীলচাষ

(১৩) ঐ ৪৫শ খণ্ড, অনুচ্ছেদ ১৩১।

করব না।" ধর, এমন কোন ব্যক্তি যার ন্যায়নিষ্ঠায় তোমার আস্থা আছে, সে তোমাকে অনুরোধ করে নীল চাষ করতে ?—কমিশন ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করে মীরপুর থানার কাংরাপুরের কুলীন মণ্ডলকে। "না, কারুর জন্যেই আমি নীলচাষ করবনা—আমার বাবা-মার জন্যও না", সোজাসুজি উত্তর দেয় কুলীন মণ্ডল।

মীরপুর থানার রামকৃষ্ণপুরের মুসলমান চাষী জর্দন মণ্ডল বলে, "নীল আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে। আমাকে খুন করতে পারেন, কিন্তু নীল আমি চাষ করবনা কিছুতেই।" নদীয়ার আরপারার পাঞ্জু মোল্লার উত্তরও কম তিক্ত নয়:

> "গুলি মেরে মেরে আমাকে ঝাঁঝরা করে ফেলুন, আমার গলা কেটে ফেলুন, কিন্তু নীল আমাকে চাষ করাতে পারবেন না।" (১৪)

কলকাতার চার্চ মিশনারি সোসাইটির রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্-এর সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় চাষীদের বিক্ষোভের তীব্রতা ছিল কত প্রচণ্ড। এদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত পাঠক আর এই সব পত্র পত্রিকায় তখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার অবিচারের সংবাদাদি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তিনি লিখেছেন কলকাতাতেও মিশনারি প্রচারকদের বারংবার একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত:

> "নীলকর সাহেবরা তো তোমাদেরই দেশের লোক। তাদের কেন বল না অত্যাচারের মাত্রাটা একটু কমাতে? যাও, আগে তাদের মধ্যে গিয়ে প্রচার চালাও।" (১৫)

দেখা যাচ্ছে নীল চাষীদের সমর্থনে ব্যাপক জনসমাবেশ ঘটেছিল।

---

(১৪) ঐ ৪৪শ খণ্ড, প্রশ্নসংখ্যা ১১৬৫-৭, ১২৫০, ১২৬২, ৩২১৪; পৃঃ ৬৫, ৬৯, ৭০, ২০৪।

(১৫) ঐ প্রশ্নসংখ্যা ১৬২৫, পৃঃ ৯৫।

সমর্থকদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী ও কিছু মিশনারিও ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মহল থেকে নীলকর সাহেবদের পক্ষে সমর্থক জুটে গেল। ভারত সচিবের কাছে লিখিত এক স্মারকপত্রে নীলকর সাহেবরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সাক্ষ্য হিসাবে দু'জন বিশিষ্ট ভারতীয়ের মতামত উধৃত করেন। এ দু'জন হলেন রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহন ও দ্বারকানাথ নীলকর সাহেবদের গুণাবলী সম্পর্কে যে প্রশস্তি গেয়েছিলেন, তা' এই স্মারকপত্রে উল্লিখিত হয়।

রামমোহন রায়ের বক্তব্য বলে উক্ত পত্রে যা উধৃত করা হয়েছে তা' এই ঃ

> "নীলকর সাহেবদের সম্বন্ধে আমি আমার মতামত সবিনয়ে উল্লেখ করছি। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নানা জেলা আমি পরিদর্শন করেছি। আমি দেখেছি নীল ক্ষেতের কাছাকাছি অঞ্চলের লোকদের জীবন-মান দূরবর্তী অঞ্চলের জীবন-মানের তুলনায় উন্নততর......। নীলকরদের দ্বারা হয়ত সামান্য কিছু ক্ষতি সংঘটিত হতে পারে, কিন্তু সরকারী কিম্বা বেসরকারী যত ইউরোপীয় এখানে আছেন তাঁদের যে কোন অংশের তুলনায়, নীলকর সাহেবরা এদেশীয় সাধারণ লোকদের অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণই বেশি করেছেন।" (১৬)

নীলের স্বপক্ষে যখন একজন চাষীর মুখ থেকে একটি কথাও বার করা সম্ভব হয়নি, তখন রামমোহন রায়ের মত ব্যক্তির কাছ থেকে এই ধরনের প্রশংসাপত্র অত্যন্ত বিস্ময়কর। এই বেদনাদায়ক ব্যাপারটি থেকে বোঝা যায় রামমোহন স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে কত দূরে এবং বিদেশীদের কত কাছে ছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মন্তব্য আরও স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন,

---

(১৬) ঐ ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৭

"আমি দেখেছি, নীলের চাষ এবং ইউরোপীয়দের বসবাস জনসমাজের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে; জমিদারেরা ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছেন; রায়তদের বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয়েছে, যে অঞ্চলে নীলের আবাদ ও উৎপাদন নেই সেই অঞ্চলের তুলনায় আমার দেশের মানুষ নীলের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চলে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে। ...কেবল জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করেই আমি এই মতামত প্রকাশ করছিনা; প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এই মতামত দিচ্ছি।"

এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য তিনি নিজের জমির কথা উল্লেখ করেছেন; নীলচাষের আগে এই জমি থেকে "সরকারী রাজস্ব দেবার মত যথেষ্ট আয়ও পাওয়া যেতনা," কিন্তু "এখন সেখান থেকে আমি বেশ কিছু মুনাফা আয় করছি।" তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যেও অনেকে "জমি থেকে বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছেন।" (১৭) নিজের মুনাফার অঙ্ক স্ফীত হয়েছে, সুতরাং আর কিছু ভাববার নেই। তাঁর পক্ষে যা ভাল, চাষীদের পক্ষেও তা ভাল! তিনি তো নীলকর শ্রেণীরই একজন; নিজের শ্রেণী স্বপক্ষে তিনি বলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি?

একদিকে নীলচাষের প্রতি নীলচাষীদের জ্বালাময়ী ঘৃণার তীব্রতম ধিক্কার আর অন্যদিকে রামমোহন দ্বারকানাথের ঐকান্তিক প্রীতির আন্তরিক অভিনন্দন—এ থেকে বোঝা যায় এই সংস্কারকরা জনগণ থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন; জনগণের অভাব অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশা থেকে তাঁরা কতদূর ছিলেন।

ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা কেবল রামমোহন আর দ্বারকানাথের স্তুতিগানই করেছেন, কিন্তু তাঁদের কর্মজীবনের এই দিকে তাঁরা কোনই

(১৭) ঐ

আলোকপাত করেন নি। নীলচাষীদের মহান্ সংগ্রাম সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের এই নিস্তব্ধতা অর্থহীন নয়। যদি বা কখনও এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়ে থাকে, তা হয়েছে নীলচাষীদের কুৎসা রটনার তাগিদেই। নীলচাষীদের অভ্যুত্থানকে অভিহিত করা হয়েছে 'নীল-চাষীদের হাঙ্গামা' বলে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও বিশেষ কিছু আলাদা নয়। ১৯১৭-১৮ সালে গান্ধীজি পরিচালিত চম্পারণ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তাঁরা পঞ্চমুখ, অথচ ১৮৬০ সালের নীল-ধর্মঘট সম্পর্কে তাঁরা একেবারে নির্বাক। পট্টভি সীতারামিয়া আমাদের জানিয়েছেন, অসহযোগের যাদুস্পর্শে "কয়েক মাসের মধ্যে জনগণের অভাব অভিযোগ দূরীভূত হয়ে গেল—অথচ শত বছর ধরে সরকার কিম্বা জনসাধারণ এই সব অভাব-অভিযোগ দূর করতে ব্যর্থ হয়েছেন।"(১৮) সীতারামিয়ার মতে "অসহযোগের হাতিয়ার" নাকি এই প্রথম আমাদের দেশে ব্যবহার করা হল। অথচ নীলচাষীরা এই 'অসহযোগের হাতিয়ার' ব্যবহার করেছেন অনেক অনেক বছর আগে। চম্পারণ সত্যাগ্রহের প্রায় ৬০ বছর আগে নীলচাষীরা ঢের বেশি বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে ঢের বেশি বৃহত্তর সাফল্যের সঙ্গে এই হাতিয়ার ব্যবহার করেছিল। গান্ধীজির চম্পারণ সত্যাগ্রহ যে কৃষকদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল, তার পেছনেও কাজ করেছিল নীল ধর্মঘটের ঐতিহ্য,—এ সত্য অস্বীকার করবে কে? কিন্তু কংগ্রেসের সরকারী ঐতিহাসিক এ সত্য উল্লেখ করবেন না, কেননা তা করলে বাংলার নীলচাষীদের গৌরবময় ধর্মঘটকেই যে গণ-অসহযোগের প্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে মেনে নিতে হয়।

---

(১৮) হিস্ট্রী অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাবনা এবং বগুড়ায় কৃষক অভ্যুত্থান—১৮৭২-৭৩

যে-সব কারণ থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং নীল ধর্মঘটের সূচনা হয়, ঠিক সে-সব কারণ থেকেই পাবনা ও বগুড়ায় কৃষক অভ্যুত্থানের উদ্ভব। কিন্তু এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে খুব কম মালমশলাই এ পর্যন্ত আমাদের গোচরে এসেছে। যাই হোক, যে মালমশলা জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে, তার ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত করা চলে যে এই অভ্যুত্থানের প্রকৃতি ছিল খুবই প্রচণ্ড।

১৮৭২-৭৩ সালের শাসনতান্ত্রিক বিবরণীতে এই অভ্যুত্থানকে "এক প্রচণ্ড এবং ভয়াবহ বিস্ফোরণ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের কেম্‌ব্রিজ ইতিহাসে বলা হয়েছে যে এই অভ্যুত্থান "সমগ্র বাংলা-দেশকেই কাঁপিয়ে তুলেছিল।" (১)

এই অভ্যুত্থানের বিস্তারিত বিবরণী 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'দি ফ্রেণ্ডস্ অব ইণ্ডিয়া', 'দি বেঙ্গল ম্যাগাজিন' এবং সাপ্তাহিক 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (জমিদারদের একটি মুখপত্র) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে সমস্ত টুকরো টুকরো সংবাদ আমরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি সেগুলিকেই একটি সূত্রে গ্রথিত করে আমরা এখানে উপস্থিত করছি। আশা করি, পুরানো পত্রপত্রিকা, সরকারী নথিপত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার ব্যাপকতর সুযোগ যখন মিলবে, তখন একটি পূর্ণতর সামগ্রিক চিত্র জনসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত হবে।

জমিদার এবং কৃষকের মধ্যে সংঘর্ষের আশু কারণ হয়েছিল "খাজনা বাড়ানোকে" কেন্দ্র করে। জমির পুরানো খাজনা ছিল

(১) দি কেম্‌ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, খণ্ড ৪, পৃঃ ২৪৯।

মাত্র ১৲ টাকা। পরবর্তী যুগে "আইনী ও বে-আইনী নানাভাবে" এই খাজনা এমনভাবে বাড়ানো হয় যে জমিদার সর্বসাকুল্যে ঠিক কত টাকা আদায় করত তা বলা শক্ত হয়ে পড়ে। পাবনা, বগুড়া এবং নিকটবর্তী জিলাগুলিতে জমিদাররা কেবল খাজনা ও সেস্ বাড়িয়েই ক্ষান্ত হল না, তারা চেষ্টা করতে থাকল কি করে পুরানো সেস্ এবং ভবিষ্যতে খাজনা দেবার জাল কবুলিয়তনামায় আটক করে কৃষকদের প্রবঞ্চনা করা যায়। এই কাজে তারা রেজিষ্ট্রেশন ব্যবস্থা ও মুন্সেফের কাছারিকে ব্যবহার করতেও পেছপা' হত না।

পাবনা বগুড়ার অভ্যুত্থানের পটভূমিকা সম্পর্কে ১৮৭২ সালের বাংলা শাসনতান্ত্রিক বিবরণীতে যা উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নে তা উধৃত করা হল ঃ—

> "অত্যন্ত উঁচু হারে নানারকমের বে-আইনী সেস্ আদায় করতে জমিদারেরা অভ্যস্ত। একেবারে হালে সেস্-সংক্রান্ত তদন্তের ভয়ে এবং খাজনা সম্পর্কে বিবৃতি-দানের বাধ্যবাধকতার ফলে…জমিদারেরা এই সেস্কে খাজনার সঙ্গে জুড়ে নেবার এবং সেই সঙ্গে খাজনা আরও বাড়িয়ে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। অথচ খাজনা বাড়াবার আগে যে নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক তা তাঁরা দেননি। সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করবার জন্যে যখন বাংলার রায়তরা ঐক্যবদ্ধ হতে শিখেছেন, তখন আইনের পথ অনুসরণ করা হবে বিরক্তিকর, ব্যয়-বহুল এবং দুরূহ। এই সংকটে পড়ে তারা বে-নিয়মে, বে-আইনীভাবে চাপা দিয়ে তাদের অভিসন্ধি সাধন করতে সচেষ্টা হলেন। যেসব জমিদার বেশি অসৎ, তাঁদের মধ্যে অনেকে কৃষকদের উপর যথাসাধ্য চাপ দিতে এবং বে-আইনী দলিলপত্র আদায় করতে লেগে গেলেন। এইসব দলিলপত্রের ফলে অত্যন্ত বর্ধিত হারে খাজনা দিতে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কিংবা

নির্ধারণ-সাপেক্ষ সেস্ দিতে, জমিদারের সঙ্গে মতভেদ হলে স্বত্বাধিকার ছেড়ে দিতে…এবং জমিদারের কৃপার উপর নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে চাষীরা বাধ্য হবে। এইভাবে রায়তদের সমস্ত অধিকার নিঃশেষে মুছে ফেলবার মতলবে কিছু জমিদার যে অত্যন্ত বে-আইনীভাবে কাজ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আর প্রথম অপরাধ যে তাঁদেরই তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এরই ফলে এল প্রচণ্ড এবং ভয়াবহ এই বিস্ফোরণ।" (২)

প্রকাশ, রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ ম্যালোনি পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টারটার এবং সিরাজগঞ্জের এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নোলান সরকারের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেন। (৩)

এইভাবে জমিদারেরা কৃষকদের কবুলিয়তনামায় সই দিতে চাপ দিচ্ছিল—যে কবুলিয়তনামায় সই দিলে স্বাক্ষরকারী যে কেবল বাড়তি হারে খাজনা ও সেস্ দিতেই বাধ্য হবে তাই নয়, জমিদারের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হলে জমিদার তাকে উচ্ছেদও করে দিতে পারবে। কিছু কিছু কৃষক চাপে পড়ে সই করে, কিছু কিছু আবার গত্যন্তর না দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কয়েকখানা গ্রাম অবশ্য দৃঢ়ভাবে জমিদারী জুলুম-বাজির প্রতিরোধ করতে থাকল। জমিদারদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, দুটি গ্রামের বিরুদ্ধে তারা খাজনার দায়ে মুন্সেফ আদালতে মামলা রুজু করে দিল। ন্যায্য খাজনা কৃষকেরা কাছারিতে জমা দিয়ে দিল কিন্তু জমিদারের অন্যায় দাবি মিটিয়ে দিতে তারা অস্বীকার করল। কিন্তু আদালতের রায় বের হল জমিদারদেরই পক্ষে। কৃষকদের উপর হুকুম হল বাকি বকেয়া মিটিয়ে দেবার জন্যে।

---

(২) অভয় চরণ দাস কর্তৃক তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান রায়ত' পুস্তকে উধৃত ; পৃঃ ৫৫৭-৮।

(৩) ঐ।

কৃষকেরা আপীল করল। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজসাহীর জজ সাহেব মুন্সেফ আদালতের রায় নাকচ করে দিলেন। তিনি রায় দিলেন, কৃষকেরা যে টাকা আদালতে জমা দিয়েছে, তাই তাদের ন্যায্য খাজনা, সুতরাং আর টাকা দিতে তারা বাধ্য নয়। এই রায়ের ফলে ১২৯টি কৃষক-পরিবার জমিদারী জুলুম থেকে রেহাই পেল। ২৷৷০ হারে খাজনা নির্দিষ্ট হল অথচ জমিদারেরা দাবি করেছিল ৫৷৷৵০ আনা হারে, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি হারে।

এই জয়ের প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎগতিতে। মাত্র দশ বছর আগে পাবনার চাষীরা তাদের একতা ও প্রতিরোধ শক্তির পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের সেই গৌরবময় স্মৃতি কৃষকদের মনে আজও জাজ্জ্বল্যমান। কাছাকাছি গ্রামের কৃষকেরা—যারা ইতিমধ্যেই সই দিয়ে ফেলেছিল অথবা দিশেহারা হয়ে বসেছিল—তারাও সংগ্রামের পথে এগিয়ে এল। শুরু হল এক ভূকম্পন। কবুলিয়তনামা কেড়ে নিতে হবে, পুড়িয়ে ফেলতে হবে—তা না হলে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। (৪)

এই সংগ্রাম চলাকালে কৃষকেরা আওয়াজ তুলল, জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ চাই। ১৮৭২-৭৩ সালের বাংলার শাসনতান্ত্রিক বিবরণীতে লেখা হয়েছে যে রায়তরা দাবি করছে, "জমিদারী উচ্ছেদ করা হোক ; তাদের সরাসরি মহারাণীর প্রজা করা হোক।" কৃষকের এই সর্বজনপ্রিয় দাবির উত্তরে তারা কি পেয়েছিল ?

উক্ত বিবরণীতে এক কথায় সেরে দেওয়া হয়েছে, "কৃষকরা উচিত শাস্তিই পেয়েছিল।" (৫)

---

(৪) দি ইণ্ডিয়ান মিরর, ২৫শে জুলাই, ১৮৭৩।

(৫) অভয় চরণ দাস কর্তৃক উধৃত ; পৃঃ ৫৫৭-৮।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মারাঠা অভ্যুত্থান

১৮৭৫

"যদি এই সব গ্রামবাসীর দৃষ্টান্ত সর্বত্র অনুসৃত হয় এবং জনগণের সর্বজনীন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে আমাদের দেশের এই দুর্গত অবস্থার অবসান ঘটবে অচিরেই।"

—সিরুর তালুকের কার্দে গ্রামের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে 'দৈনান চাকৃস্থ' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে জনৈক ভ্রমণকারীর পত্র (২৭শে জানুয়ারী, ১৮৭৫)।

যে যে অবস্থা থেকে পুণা আর আহমদনগর জেলায় কৃষি-অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সারা রায়তী অঞ্চল জুড়েই তখন সে সব অবস্থা বর্তমান ছিল। এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য পরবর্তীকালে যে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়, সে কমিশনকেও স্বীকার করতে হয়েছিল যে,

"গ্রামবাসীদের দুরবস্থা এমন চরমে উঠেছিল যে সুপা (অভ্যুত্থান যেখানে শুরু হয়) যদি উদ্যোগ না-ও নিত, তা হলে অন্য কোন জায়গা নিশ্চয়ই উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসত। বিস্ফোরণের মালমশলা তৈরি ছিল সকল জায়গাতেই; অপেক্ষা ছিল কেবল একটি স্ফুলিঙ্গের; কোন একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ, কোন একটি পরিকল্পিত ঘটনা বা কোন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে সুনিশ্চিত ভাবেই এই স্ফুলিঙ্গ আগুন হয়ে জ্বলে উঠত।" (১)

---

(১) দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশনের রিপোর্ট, (পার্লিয়ামেণ্টারি পেপারস্, ৫৮ খণ্ড, ১৮৭৮); পৃঃ ২; সংক্ষেপে শুধু 'রিপোর্ট' নামে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষক অভ্যুত্থানকে সরকারী ভাষায় কিভাবে ব্যঙ্গ করা হয় 'দাঙ্গা' কথাটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আসল মাথাব্যথা ছিল কেবল একটি বিষয় সম্পর্কে। তা হল রাজস্ব হিসাবে বিপুল অর্থের অব্যাহত প্রবাহ কি ভাবে সুনিশ্চিত করা যায় তার ব্যবস্থা করা। স্বভাবতই জমি-বন্দোবস্তের সময়ে চাষীদের উপরে খাজনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল অত্যধিক চড়া হারে। ফসলের পরিমাণের সঙ্গে এই খাজনার হারের কোন সম্পর্কও ছিল না ; টাকার অঙ্কে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা যথাসময়ে জমা দিতে হবেই হবে। সেই ১৮৫০ সালেই স্যার জি. উইনগেট এই ব্যাপারটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন, "অতীতে কোন এক তহশীলদার দাক্ষিণাত্যের ব্যয়-ক্ষমতা সম্পর্কে যে অতিরঞ্জিত হিসাবে তৈরি করেছেন এবং কাজে প্রয়োগ করে গিয়েছেন, তার ফলে দেশের কৃষি-পুঁজি আজ নিঃশেষিত—এ সিদ্ধান্ত অনস্বীকার্য।" দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশনও এ বিষয়ে একমত যে "কৃষকদের ব্যয়ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত হিসাবের" ভিত্তিতে অত্যন্ত চড়া হারে খাজনা ঠিক করা হয়েছিল।" (২)

দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকট হামেশাই লেগে থাকত। বৃষ্টি হোক আর না হোক, সরকারের দাবিদাওয়া মেটাতেই হত। ফসলের দামের উঠতি-পড়তির ফলে সমস্যা হয়ে উঠত আরও ঘোরালো ; খাজনা বুঝিয়ে না দিতে পারলে জমিজমা বাজেয়াপ্ত হবে, নীলামে চড়বে। সুতরাং ঘটনার চাপে ধারের জন্য চাষীদের হাত পাততে হত মহাজনদের কাছে।

আগে মহাজন ছিল একজন যৎসামান্য ব্যক্তি—হয় গ্রামের হিসেব-রক্ষক আর নয়তো গ্রামের ক্ষুদে দোকানদার। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থা একেবারে ঘুরে গিয়েছে। ধারের বদলে বন্ধকী জমি প্রাপ্তি আর কৃষকের বিরুদ্ধে সরকারী পোষকতা লাভ—এর কল্যাণে মহাজন হয়ে

(২) ঐ, পৃঃ ১০।

উঠল একটা গুরুত্বপূর্ণ কেউকেটা। চাষী যদি ধার শোধ করতে পারত, তা হলে সে আদায় করে নিত অসম্ভব রকমের স্থদ আর চাষী যদি তা না পারত, সে কব্জা করে নিত তার জমিজমা—অবশ্য সরকারী ডিক্রীর প্রসাদেই। এদিকেও লাভ ওদিকেও লাভ—এমন স্থখের ব্যবসায়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে আর কতক্ষণ! সামান্য মহাজন হয়ে উঠল এক অসামান্য ব্যক্তি।

বৃটিশ ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং দেওয়ানী আদালতের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ স্যার উইনগেট প্রায় পঁচিশ বছর আগেই এমন একটা ব্যাপারের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,

> "ধারের টাকা আদায় করার ব্যাপারে আইনে যে সব স্থযোগ স্থবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার ফলে ধারের পরিমাণ অত্যন্ত বিপজ্জনক মাত্রায় ফেঁপে উঠেছে।······সমস্ত শ্রেণীর মানুষই আজ দেনার দায়ে জর্জরিত। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তা হলে সমাজের ভূসম্পত্তির বৃহত্তর অংশই হস্তান্তরিত হয়ে যাবে একটি ক্ষুদ্র বিত্তবান্ শ্রেণীর কবলে। সমগ্র সমাজকে সর্বস্বান্ত করে এই ক্ষুদ্র শ্রেণীটি অতুলনীয় ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে বসবে। অনেকজনের সর্বনাশ আর কয়েকজনের পৌষমাস—এর চাইতে বড় অভিশাপ কোন জাতির ইতিহাসে ঘটতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিভাগে দেনাদার আর পাওনাদারে যে সম্পর্ক তার অনিবার্য গতি সেই দিকেই।" (৩)

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্যার উইনগেটের এই বিশ্লেষণ নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। কৃষকদের ঋণের পাহাড় উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকল। সেই সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে উঠল দেওয়ানি মামলার সংখ্যা—কৃষকদের

(৩) ঐ, পৃঃ ১৬।

জমি করতলগত করবার মতলবে। মাত্র চৌদ্দ বছরে এই ধরনের মামলা বেড়ে দাঁড়াল চৌদ্দগুণ।

জমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার সংখ্যা ঃ

১৮৫১-১৮৬৫

	১৮৫১	১১৬১	১৮৬৫
আহমেদনগর	৯৮	৩১৮	৬৮৯
পুণা	৭৫	২৮২	৬৩২

জমি মর্গেজ হওয়া মানেই ছিল চিরতরে বেহাত হওয়া। কমিশনের মতে ঃ

> "মর্গেজ থেকে মুক্তির দৃষ্টান্ত একেবারে নেই বললেই চলে। মর্গেজ হওয়া আর কৃষকের স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত হওয়া—এ দু'য়ের অর্থ একই দাঁড়িয়ে গিয়েছে।" (৪)

১৮৫৭ সালে রাজস্ব কমিশনার মিঃ ইনভেরারিটি আহমেদনগরের কালেক্টর মিঃ টাইটলারের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। 'সৎ ও সুযোগ্য কর্মচারী' হিসাবে মিঃ টাইটলার সুপরিচিত ছিলেন। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

> "আমাদের আদালতগুলি যে সাহায্য দিয়ে থাকে তা সবই যায় মারোরাড়ীদের পক্ষে। মারোয়াড়ীরাই জানে কি করে এই সাহায্য স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। স্বভাবতই, একদিকে পাওনাদার বাদী অন্যদিকে দেনাদার প্রতিবাদী, অবস্থা এমন সহজ সরল ছিল না ; অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম ঃ **দেওয়ানী আদালতের পৃষ্ঠপোষিত** জালিয়াৎ মারোয়াড়ী বনাম অসহায় রায়ত, যারা বিষয়বস্তু না জেনেই যে কোনও দলিলে সই দেয়

(৪) ঐ প্যারা ৭০-৭১।

আর যে-ডিক্রীই পাশ হোক না কেন তাকে বাধা দিতে অক্ষম। সমাজের অভ্যন্তরে এই ব্যাপারটি মেয়াদী ক্ষতের মত জ্বালা দিতে থাকে, আর এর সমস্ত দায়িত্বই জনসাধারণ আরোপ করে দেওয়ানী আদালতের উপরে।......সরকার এবং জনসাধারণ—উভয়েরই কাছে সমস্যাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভার এমনই অসহনীয় যে প্রাচ্যখণ্ডের নিষ্ক্রিয় সমাজের পক্ষেও তা সয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে; তাই এই ভার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মাঝে মাঝে তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে থাকে। সংখ্যা ও শক্তির দিক থেকে তাদের এই প্রয়াস বেড়ে উঠতে বাধ্য।" (৫)

সরকারের সমগ্র আইনগত ব্যবস্থা এইভাবেই জমিদার আর মহাজনদের স্বার্থের জোয়ালে বাঁধা ছিল। আইনগত সুযোগ-সুবিধা থেকে কৃষকসমাজ ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

রেভিনিউ কমিশনারের এই কড়া হুঁসিয়ারী এসেছিল সরকারী কেতাদুরস্ত কায়দায়; তাই সরকারকে এ ব্যাপারে নজর দিতে হল। সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ করলেন:

"সপারিষদ বড়লাট বাহাদুরের মনে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে এদেশীয় শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি মহাজনের অনাচারের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় না পাবার দরুন নিদারুণ অবিচারে নিপীড়িত হয়ে থাকে। তিনি মনে করেন যে অতিমাত্রায় সুদখোর পুঁজিদারদের অবিশ্বাস্য রকমের অর্থগৃধ্নুতার যন্ত্র হিসেবে কাজ করবার জন্য আমাদের দেওয়ানী আদালতগুলি জনগণের ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান আইনগুলি বাস্তবে যেভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে তার ফলে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিরাগ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে আর কোনও ভাবেই তা সৃষ্টি হত না।

---

(৫) ঐ, পৃঃ ১৬।

আইন পরিষদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং রেভিনিউ কমিশনারের পত্রের একখানা প্রতিলিপি তাঁদের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হচ্ছে।" (৬)

আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন "আত্মসমালোচনার" এই আড়ম্বরের পর সরকার কিছু ভাল ভাল আইন-কানুন তৈরির দিকে সচেষ্ট হল। আসলে কিন্তু কিছুই হল না। কমিশন শুষ্কভাবে মন্তব্য করল, "তখনকার মত ব্যাপারটি ছেড়ে দেওয়া হল।"

প্রায় বারো বছর পরে সরকারী মনোযোগ আবার এদিকে আকৃষ্ট হল। ১৮৭০ সালে উত্তর বিভাগের রেভিনিউ কমিশনার বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,

> "পশ্চিম খান্দেশে বর্তমানে যে অবস্থা বিদ্যমান, ঠিক এই ধরনের অবস্থা থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহের উদ্ভব হয়েছিল। আসন্ন বিস্ফোরণের কোনও ইঙ্গিত যদি না-ও পাওয়া গিয়ে থাকে তবু ভুলে গেলে চলবে না যে সাঁওতালরাও আগেভাগে একটি বারও কোনও হুঁসিয়ারি দেয় নি। আইনের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে যে মহাজনরা তাদের লুণ্ঠন করত ও কৃতদাস বানাত তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের অভিযানে বীরভুমের মাঠে-প্রান্তরে সামিল হয়েছিল ত্রিশ হাজার সাঁওতাল। (৭)

পর্বতকেও হয়তো টলানো যায় কিন্তু বোম্বাইয়ের সরকার অটলনীয়, বিশেষ করে যখন জনগণের কল্যাণজনক কোনও ব্যাপার সেখানে জড়িত।

ওদিকে কিন্তু কৃষকদের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে চলেছিল।

---

(৬) ঐ, পৃঃ ১৬-৭।

(৭) এস্, এস্, থর্নবার্ন, মুসলমানস্ এ্যাণ্ড দি মানিলেণ্ডার্স ইন দি পাঞ্জাব, (লণ্ডন, ১৮৮৪) পৃঃ ৬৪।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে যে তূলার দর হয়েছিল আকাশ-ছোঁয়া, তা পড়ে গেল মন্দার অতল গহ্বরে। তূলার দামের পিছু পিছু অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের দামও দ্রুতবেগে পড়তে শুরু করল। কৃষিপণ্যের বাজারে সাধারণ মন্দা নেমে এল। কৃষকদের আর্থিক আয় মারাত্মক-ভাবে কমে গেল। এর উপরে আবার এল ছিয়াত্তরের সর্বনাশা মন্বন্তর।

সমৃদ্ধির বছরগুলিতেই কৃষকদের পক্ষে এত উঁচুহারে খাজনা দেওয়া দুঃসাধ্য; এখন তো তা একেবারেই অসাধ্য হয়ে পড়ল। রাজস্ব ব্যবস্থার কঠোরতা এতটা কুখ্যাতি অর্জন করেছিল যে 'দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা-কমিশন'ও এ নিয়ে ঠাট্টা না করে পারেন নি। একটি প্রচলিত কাহিনীর মোড়কে এই বিদ্রূপ তাঁরা উপহার দিয়েছেন ঃ

> "একজন মানুষ একটি নদী হেঁটে পার হওয়া মনস্থ করল। তাই নদীটির বিভিন্ন জায়গার জলের গভীরতা সম্পর্কে সে খোঁজ-খবর করতে লাগল। কোনও জায়গায় জল তার মাথারও উপরে, আবার কোথাও তার হাঁটুও ডোবে না এমন জল, ইত্যাদি ইত্যাদি। হিসেব করে সে দেখতে পেল যে জলের গড়পরতা গভীরতা তার মাথার নীচে। সুতরাং সে নিশ্চিন্তে নদী পার হবার জন্য হাঁটতে শুরু করল।—বলা বাহুল্য, পরিণামে তার সলিল সমাধি হল।" (৮)

ফসল হোক আর নাই হোক, দাম তেজী থাক বা মন্দা থাক, সরকারের দাবি মেটাতেই হবে। তাই মহাজনদের ভয় হয়ে গেল পাছে সরকার বকেয়া খাজনা উশুলের অজুহাতে কৃষকের জমি নিয়ে নেয়, কারণ সে-ক্ষেত্রে মহাজনরা তাদের দাদনের টাকা উদ্ধার করতে পারবে না। সুতরাং মামলার পরে মামলা রুজু হল, ডিক্রীর পর ডিক্রী জারি হল—কৃষকরা দলে দলে জমি থেকে উৎখাত হল।

---

(৮) রিপোর্ট, পৃঃ ২৪।

প্রকাশ, কৃষকদের এক-তৃতীয়াংশই দুর্বহ ঋণভারে জর্জরিত ছিল। দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা-কমিশনের মতে এর অর্থ হল নিশ্চিতভাবে এদের জমি বেহাত হওয়া।

কৃষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। যে কাঠামোর জাঁতাকলে তারা নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল তার কাজ কারবার সম্পর্কে তারা তখনও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল না। অবশ্য সরকারের সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা না থাকলেও মহাজনদের ভূমিকা তাদের অজানা ছিল না। ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে ডিক্রীর পর ডিক্রী জারি হচ্ছে; চোখের উপর দিয়ে তাদের বাড়িঘর জমিজমা মহাজনদের কবলে চলে যাচ্ছে। বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। অভিজ্ঞতা থেকে তারা দেখেছে যে সরকারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করা নিরর্থক।

ভূমি থেকে বঞ্চিত হয়ে পুণা ও আমেদাবাদের কৃষকদের মনে ক্রোধের আগুন পুঞ্জীভূত হতে লাগল। পরে এই আগুন ফেটে পড়ল মহাজনদের বিরুদ্ধে। তারা মহাজনদের চুক্তিনামা, নথিপত্র সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সিরুর তালুকের কার্দে গ্রামে যেসব ঘটনা ঘটে, সেগুলিই হল পুণা আর আমেদনগর জেলার আসন্ন কৃষক অভ্যুত্থানের প্রথম প্রকাশ্য আভাস।

কার্দে গ্রামের প্রধান মহাজন ছিল মারোয়াড়ী কালুরাম। বাবা সাহেব দেশমুখ নামে জনৈক কৃষকের বিরুদ্ধে এই ব্যক্তিটি একটি মামলা দায়ের করে এবং তালেগাঁওয়ের আদালত থেকে একটি ডিক্রী লাভ করে। দেশমুখের বাড়ী নীলাম করা হল; মারোয়াড়ী কালুরাম ১৫০৲ টাকায় তা কিনে নিল। কিন্তু বাড়ীখানা এই নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়েই তার সাধ মিটল না; সে বাড়ীখানা ভেঙে ফেলতে শুরু করল এবং দেশমুখকে হুকুম করল বাড়ী ছেড়ে দিতে। বাবাসাহেব

অন্যান্য কৃষকের মতই শান্তিপ্রিয় মানুষ; কালুরামকে সে অনুরোধ করল বাড়ীখানা ভেঙে না ফেলতে এবং তাকে সেখানে থাকতে দিতে। সে প্রতিশ্রুতি দিল যে, তার দেনা সে শোধ করে দেবে এবং যতদিন সে ঐ বাড়ীতে বাস করবে ততদিন যথারীতি ভাড়াও দেবে। কিন্তু মহাজন না শোনে ধর্মের কাহিনী; বাবা সাহেবকে সে হয়রানি করতে থাকল।

বাবাসাহেব তখন দিশেহারা হয়ে পড়ল। সে গ্রামবাসীদের এক বৈঠক করল। গ্রামবাসীদের প্রত্যেকেরই এই মহাজনদের প্রতি কোন না কোন অভিযোগ ছিল। তারা প্রস্তাব পাশ করল যেহেতু কালুরাম, শচীরাম, শিবরাম এবং প্রতাপ কৃষকদের সর্বনাশ করবার জন্যই কোমর বেঁধেছে সেহেতু তারা এদের সঙ্গে কোন যোগাযোগই রাখবে না। এই মহাজনদের এইভাবে এক-ঘরে করে দেওয়া হল। এই বয়কট এত ব্যাপক হল যে ভিস্তিওয়ালা, নাপিত এবং চাকররা পর্যন্ত তাতে যোগ দিল। নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য গ্রামবাসীরা নিজেরাই একটি মুদীর দোকান খুলল। এইভাবে একঘরে হয়ে মহাজন পুঙ্গবেরা সিরুরে পালিয়ে যেতে মনস্থ করল। এবারে এল চাষীদের পালা, তারা তাদের পালাতে দিতে রাজী নয়। ফলে মহাজনদের মাল-বোঝাই গাড়ী ঠেলবার লোক মিলল না। পরে পুলিসের সাহায্য ও আশ্রয়ে তারা সিরুরে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। (৯)

মহাজন আর সরকারী কর্মচারীরা হয়ত এই ঘটনার তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে পারেনি, এদিকে কিন্তু গ্রামে-গ্রামে কৃষকদের মধ্যে মন্ত্রণা ও মহড়ার ধুম পড়ে গেল—এখন কি করা হবে এই নিয়ে।

(৯) 'দৈনান চাকসু'র সম্পাদকের কাছে লেখা ভ্রমণকারীর চিঠি, ২৭শে জানুয়ারী, ১৮৭৫; 'রিপোর্টে' উল্লিখিত, পৃঃ ১।

ভীমতারি তালুকের স্থপা গ্রামের হাটের দিন ছিল ১২ই মে। অন্যান্য হাটবারের মত ঐ দিনটিতেও শত শত কৃষক হাটে জমায়েত হল। বাইরে থেকে মনে হয় তারা বাজার সওদা করতেই এসেছে; ভিতরে ভিতরে কিন্তু তাদের পরিকল্পনা ছিল আলাপ। যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্রের কৃষকসমাজ তাঁকে যে "অভিনন্দন" জানিয়েছিল, এই পরিকল্পনায় তা রূপ পেয়েছিল চমৎকারভাবে।

কৃষক অভ্যুত্থানের কারণ সম্পর্কে সন্ধান করবার জন্য পরবর্তীকালে যে 'দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা' কমিশন নিযুক্ত হয়, তাঁরা এ সম্পর্কে লিখেছেন :—

"প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই হাঙ্গামাকারীদের লক্ষ্য ছিল পাওনাদারদের কাছ থেকে চুক্তি-নামা, ডিক্রী প্রভৃতি দখল করা এবং সেগুলি ধ্বংস করা। পাওনাদাররা যদি সমবেত জনতার হাতে বিনা প্রতিবাদে সেগুলি অর্পণ করত, তা হলে কোন উপদ্রবই হত না। কিন্তু যদি কোন মহাজন অস্বীকার করত অথবা ঘরে আগল দিয়ে থাকত, তবে তাকে ভয় দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করার জন্য কিম্বা নথিপত্র দিয়ে দেবার জন্য হিংসার ভয় প্রয়োগ করা হত।" (১০)

স্থপার ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই ১৪ মাইল দূরবর্তী ক্ষীরগাঁওয়ে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। পয়লা নম্বর মহাজন ধুরন্ধরের খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হল এবং তাকে বাধ্য করা হল চুক্তিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি সমর্পণ করতে। পরে গাঁয়ের মাঠে জড়ো হয়ে সেগুলিকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই ভীমতারি তালুকের আরও কয়েকটি গ্রামে একই ঘটনার অনুষ্ঠান হল। স্থপার কৃষকেরা যে অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিল তাই ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামান্তরে দাবানলের মত। ইন্দপুর

(১০) ঐ, পৃঃ ২।

ও পুরন্দরের মত প্রতিবেশী জেলাগুলিও ক্রমে এই সংগ্রামে অংশীদার হল।

মারোয়াড়ী ও গুজরাটি মহাজনেরা গ্রাম থেকে পালাতে শুরু করল। সিরুর তালুকের বভ্র গাঁয়ের মহাজনটি কিন্তু দলিলপত্র হাত-ছাড়া করতে অস্বীকৃতি জানাল। অবশ্য প্রাণ হারাবার ভয়ে শেষ পর্যন্ত সব দলিলপত্রই সে কৃষকদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ঐ গ্রামেই মাত্র দু'বছর আগে তার কাকা দেনাদারদের হাতে নিহত হয়। অন্যান্য গ্রামও ক্রমে ক্রমে এই ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে সামিল হল; এসব বিদ্রোহী গ্রামের মধ্যে কার্দে অন্যতম। দাম্‌রে গ্রামের এক মহাজন পা-ভাঙ্গা অবস্থায় কাতরাচ্ছিল। জ্বলন্ত ঘর থেকে তাকে উদ্ধার করে কৃষকেরা তার প্রাণ বাঁচায়।

পুণা জেলার অবস্থা যখন এই রকম, আমেদনগর জেলা তখন শান্ত থাকার কথা নয়। আমেদনগর জেলার কাছাকাছি তালুকগুলিতেও এখানে সেখানে বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। এমনিভাবেই গ্রামের ভূকম্পন কাঁপিয়ে তুলল অন্যান্য গ্রামকে; দু সপ্তাহের মধ্যে শ্রীগোণ্ডা, পার্ণার, নাগর এবং কারজাত বিদ্রোহী কৃষকদের বিক্ষুব্ধ অভিযানে দুলে উঠল।

এই অবিচার-অত্যাচারে কৃষকেরা তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। আর এই অবিচার ও অত্যাচারের অন্যতম প্রতীক হল মহাজনদের দলিলপত্র। তাই এই দলিল-দাহনের বহ্ন্যুৎসবে তারা উদ্দাম হয়ে উঠল। কিন্তু সরকারও চুপ করে বসে ছিল না। গত পঁচিশ বছর ধরে কৃষকদের তরফ থেকে বার বার তাগিদ ও হুঁশিয়ারি আসা সত্ত্বেও যে-সরকার জমিদার বা মহাজনদের বিরুদ্ধে এতটুকু ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি, সেই সরকারই এবারে অতিমাত্রায় সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠল। কৃষকদের বিরুদ্ধে শুরু হল দমনপীড়নের তাণ্ডব লীলা।

মহাজনদের "ক্রিয়াকলাপের পেছনে সরকারের সমর্থন আছে"— কৃষকদের এই সন্দেহ এইভাবেই সরকার সপ্রমাণ করল। (১১)

সমগ্র পুলিস বাহিনীকে পাঠানো হল "আইন ও শৃংখলা" পুনরুদ্ধারের "মহান ব্রত" প্রতিপালনের জন্য। কিন্তু জাগ্রত কৃষক-সমাজের সম্মুখে তারা নিজেদের একান্ত অসহায় মনে করায় ডাক পড়ল সৈন্যদলের। একটি পদাতিক বাহিনীকে পাঠানো হল সুপাতে। সিরুরে মোতায়েন পুণা ঘোড়সওয়ার বাহিনীর উপর নির্দেশ এল ঝাঁপিয়ে পড়বার। আর একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হল শ্রীগোণ্ডায়। সারা তল্লাট ছেয়ে ফেলা হল পিটুনী পুলিস আর সামরিক ঘাঁটি দিয়ে। এর খরচ চালাবার জন্য গ্রামের পরে গ্রামের কাছ থেকে আদায় করা হল পাইকারি জরিমানা। ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেল। মাত্র দু' সপ্তাহেই পুণা জেলার ৫৫৯ জন আর আমেদনগর জেলার ৩৯২ জন গ্রেফতার হল। (১২) নৃশংস নিষ্পেষণের নির্মম রথচক্র চালিয়ে দেওয়া হল প্রস্তুতিহীন অস্ত্রশস্ত্রহীন কৃষক-সমাজের বিক্ষুব্ধ বুকের উপর দিয়ে। অথচ কি ছিল তাদের অপরাধ? মহাজনদের সঙ্গে সরাসরি একটা বোঝাপড়ার জন্য তারা একত্র সামিল হয়েছিল—হ্যাঁ, এই ছিল তাদের অপরাধ।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এই পিটুনী ব্যবস্থার সাহায্যে সরকার কৃষক-অভ্যুত্থানকে দাবিয়ে দিতে সক্ষম হল। কিন্তু আগুন একেবারে নিবে গেল না, বাইরের আগুন অন্তরে আশ্রয় নিল, সেখানে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকল। ১৫ই জুন ভীমতারি তালুকের মুন্ধলী গ্রামে এই আগুন আবার আত্মপ্রকাশ করে; কৃষকেরা প্রকাশ্যেই আবার বিদ্রোহ করে। ২২শে জুলাই ঐ একই তালুকের নিম্বুত

(১১) ঐ, পৃঃ ৩।

(১২) ঐ

গ্রামে কৃষকেরা মহাজনের নথিপত্র দখল করে। দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রী জারি করতে এসে জনৈক রাজপুরুষ কৃষকদের হাতে পড়ে ; কৃষকেরা তার নাকটি কেটে ফেলে। (১৩)

দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা কমিশনের রিপোর্ট থেকে কৃষকদের তৎকালীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। জুন থেকে জুলাই পর্যন্ত ভীমতারিতে যে পুনঃ পুনঃ কৃষক-বিক্ষোভ ফেটে পড়ে তাতে একটি সত্যই প্রমাণিত হয় ; তা হল এই যে, "জেল, সাজা, আর পিটুনী পুলিসের ঘাঁটি চাষীদের জঙ্গী মেজাজকে দাবিয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু তাকে নিবিয়ে দিতে পারেনি।" (১৪)

পুণা ও আমেদনগরের কৃষক বিদ্রোহের বাণী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই অভ্যুত্থানের সংবাদ যে "সারা দেশের সকল অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে সন্দেহ নাই।" পুণা জেলার সীমানা থেকে একশো মাইল দূরে কুকরুর গ্রামের চাষীরা কিছুদিন যেতে না যেতেই গুজরাটি মহাজনদের বিরুদ্ধে অনুরূপ এক আন্দোলন শুরু করে দেয়। একশোরও বেশি কৃষক মহাজনদের বাড়ী আক্রমণ করে, "বাড়ীর সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ, হিসাবপত্র এক জায়গায় এনে সেগুলিকে ধ্বংস করে এবং তারপর সরে পড়ে।" (১৫)

পুণা এবং আমেদনগরের কৃষক-অভ্যুত্থানের সক্রিয় অধ্যায় স্থায়ী হয় মাত্র তিন সপ্তাহ। সরকারের ভয়াবহ নিষ্পেষণের মুখে প্রস্তুতিহীন কৃষকেরা সক্রিয় সংগ্রাম চালু রাখতে সক্ষম হল না। তবে এই ধরনের সংগ্রামের মারফতেই এই উপলব্ধি ঘটল যে সরকার আসলে জমিদার আর মহাজনদের পৃষ্ঠপোষক।

---

(১৩) ঐ

(১৪) ঐ

(১৫) ঐ।

এই বিদ্রোহ স্বল্পকালস্থায়ী হলেও একথা ভুললে চলবে না যে কী ব্যাপক গণ-সমর্থন এর পেছনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিদ্রোহীদের "বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ" সংগ্রহ করাও সরকারের কাছে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। (১৬)

মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভিযোগ অসংখ্য এবং সাংঘাতিক। তৎসত্ত্বেও মহাজনদের শারীরিক নিরাপত্তা সম্পর্কে কৃষকেরা যে বিবেচনা দেখিয়েছে তা তাদের অপূর্ব আত্মসংযমের পরিচায়ক। অত্যাচারী মহাজন ও সরকারের বিরুদ্ধে এ একটি সামগ্রিক বিদ্রোহ নয়। আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,

"খুবই নির্দিষ্ট ও বাস্তব একটি লক্ষ্য সফল করা, যথা শত্রুর হাত থেকে তার হাতিয়ার (দলিল ও হিসাবপত্র) কেড়ে নিয়ে তাকে নিরস্ত্র করা ; আর এই লক্ষ্য সাধনে শক্তি-প্রয়োগ নয়, শক্তি প্রদর্শনই সাধারণভাবে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল।" (১৭)

সাদাসিধে এই লক্ষ্যের পেছনে ছিল একটা অপরিণত ধারণা। কৃষকেরা মনে করেছিল যে নথিপত্র প্রভৃতি ধ্বংস করে দিলেই বুঝি মহাজনদের অত্যাচার সাঙ্গ হয়ে যাবে। এই ধরনের সংগ্রামের মারফতেই কৃষকদের এই চেতনা এল যে তাদের অভাব-অভিযোগের সমূহ সমাধানের জন্য চাই মহাজন ও জমিদারের পৃষ্ঠপোষক শাসক-চক্রের অপসারণ। এই শাসকচক্রই এদের জুলুমবাজি আর জবরদস্তিকে সাহায্য করে সমস্ত শক্তি দিয়ে।

যে ক্ষিপ্রতা ও নৃশংসতা সহকারে সরকার কৃষক-অভ্যুত্থানকে দমন করল শুধুমাত্র গ্রেফতারের সংখ্যা থেকেই তা ফুটে ওঠে। মোট

---

(১৬) ঐ।

(১৭) ঐ, পৃঃ ৪।

১৬ লক্ষ লোকের বাস এমন দুটি জেলাতেই মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যে গ্রেফতার করা হয় হাজারের অধিক কৃষককে।

এই সংখ্যার তাৎপর্য বুঝতে হলে অসহযোগ আন্দোলনে গ্রেফতারের সংখ্যার সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখা দরকার। প্রথমবারের অসহযোগ আন্দোলনের চরম পর্যায়ে (১৯২২ সালের গোড়ার দিকে) মোট ধরপাকড় হয় ৩০,০০০। দ্বিতীয়বারের অসহযোগ আন্দোলনে (১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্ধী-আরুইন চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত) সরকারী হিসাবমতে দণ্ডপ্রাপ্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০,০০০; কংগ্রেস হিসাবমতে ৯০,০০০। (১৮)

অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল ২৫০টি জেলায় আর তার স্থায়িত্বকালও ছিল দীর্ঘ। সুতরাং ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ১৮৭৫ সালে মাত্র দুটি জেলায়—পুণা আর আমেদনগরে—অত্যন্ত অল্পকাল স্থায়ী কৃষক-অভ্যুত্থানে ধরপাকড় ও সাজাপ্রাপ্তের যে সংখ্যা দাঁড়ায় জেলাপিছু হিসাবে কংগ্রেস-পরিচালিত বৃহত্তম অসহযোগ আন্দোলনের সংখ্যার চাইতেও তা অনেক বেশি।

পুণা আর আমেদনগরের অভ্যুত্থানে মহাজনদের কাছ থেকে দখল করে নেওয়া নথিপত্রের ভস্ম ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। কৃষকও সারা দেশ জুড়ে কৃষক-বিক্ষোভের শিখায় শিখায় লেখা হয়ে গেল কৃষকমাজের অন্যতম দাবি—"কৃষকের দেনা খারিজ কর!"

যদিও প্রচণ্ড দমনপীড়নের সাহায্যে সরকার এই অভ্যুত্থান দাবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ কৃষক-সংগ্রামের উপর এর প্রবল প্রভাব সে প্রতিরোধ করতে পারেনি। কৃষকদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে যে অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তা সরকার এতদিন দেখিয়ে এসেছে,

(১৮) পট্টভি সীতারামিয়া, হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ান গ্যাশনাল কংগ্রেস, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৮৭৬।

ফলে এবারে তাকে তা ছাড়তে হল; কৃষকদের স্বার্থে কিছু কিছু আইন পাশ করবার জন্য সরকারকে নিষ্ক্রিয়তার খোলস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হল। ১৮৭৯ সালে 'দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবী সাহায্য আইন' চালু হয়। এই আইনের ফলে কৃষকদের উচ্ছেদের উপরে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়, সুদের হারও কিছুটা সংযত করা হয়।

অনেকে হয়ত অবাক হয়ে ভাববেন, মহাজনেরা তো কৃষকদের উপকারই করে থাকে; তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাক কৃষকেরা তাদের শত্রু মনে করে;—কিন্তু কেন? কমিশনের সদস্যরাও এই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন; তাঁদের ধারণা, মহাজনেরা একান্তই নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তি, অন্যায়ভাবেই তাদের উপর হামলা করা হচ্ছে। কমিশন মন্তব্য করেছেন, "যখন দেনার বোঝার সঙ্গে এমন কিছু ঘটনা যুক্ত হয় যা থেকে কৃষকদের মনে এই ধারণা জন্মে যে দুঃখকষ্ট, অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার নেই, তখনই একটা শত্রুতার ভাব তাদের মনে দানা বাঁধতে থাকে এবং মাঝে মাঝে এই মনোভাব হিংসামূলক কাজে আত্মপ্রকাশ করে, যেমন এক্ষেত্রে করেছে।" (১৯)

মহাজনেরা দরিদ্র বিধবাদের মত নয়, যাঁরা সারাজীবনের পুঁজিপাটা থেকে অভাবী প্রতিবেশিদের দয়া করে দু'চার আনা ধার দিয়ে থাকে। মহাজনেরা হল অর্থপিশাচ সুদখোর, বিদেশী সরকারকে সমর্থনের বিনিময়ে যারা পেয়েছিল স্বদেশী কৃষক সমাজকে লুণ্ঠন করবার অবাধ পরোয়ানা। সুতরাং বিক্ষুব্ধ কৃষকসমাজের বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য যে এই মহাজনেরা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

পুণা আর আমেদনগর অভ্যুত্থান আরও একটি প্রশ্নের চূড়ান্ত

(১৯) 'রিপোর্ট' পৃঃ ৩৩।

জবাব দিয়ে দিয়েছে। কৃষকদের দেনার কারণ হিসাবে অনেকে বিয়ে সাদী, শেষকৃত্য, পূজাপরব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত ব্যয়ের ওজর হাজির করে থাকে। অন্যান্য অনেকে আছে যারা আবার কৃষকদের 'অমিতব্যয়িতা' সম্পর্কে এতটা মুখর নয়, তাদের মতে কুঁড়েমি আর অপদার্থতাই সব সমস্যার মূল কথা। সমগ্র প্রশ্নটিই কমিশন সরেজমিনে সবিস্তারে তদন্ত করে দেখেন। এই প্রসঙ্গে এই কমিশনের বক্তব্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে আজও পর্যন্ত তার তাৎপর্য কমে যায়নি। তাই সম্পূর্ণ অংশটিই এখানে তুলে দেওয়া হল :

"কমিশনের তদন্তকার্যের ফলাফলে দেখা যায় যে রায়তদের ঋণের কারণ হিসাবে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে অর্থব্যয়ের উপর অহেতুক প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যে অর্থব্যয় করা হয়, (রায়তদের সঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে) তাকে নিঃসংশয়ে অমিতব্যয় বলে অভিহিত করা যায় ; কিন্তু এই সমস্ত অনুষ্ঠান তো কালেভদ্রে ঘটে থাকে ; অধিকন্তু সামাজিক ও ঘরোয়া আনন্দানুষ্ঠানে মোট যে ব্যয় হয়, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমাজ-মর্যাদার তুলনায় অধিক নয়। ঋণের হিসাব খাতায় এই ধরনের ব্যয় আরও পাঁচটি ব্যয়ের মধ্যে একটি ব্যয় বলে উল্লিখিত হতে পারে ; কিন্তু কোনক্রমেই একে ঋণের মূল কারণ বলে উপস্থিত করা যায় না। মনে হয় এই ধরনের ব্যয়ের অঙ্ককে সাধারণ ভাবে অতিরঞ্জিত করে ধরা হয়েছে ; অথবা এই কাজে নিযুক্ত রাজকর্মচারীরা অন্যান্য কারণগুলিকে উপেক্ষা করেই এই বিষয়টিকে মূলত দায়ী করেছেন। অবশ্য এই ধরনের উপেক্ষা খুবই স্বাভাবিক ; কারণ বিবাহ বা অনুরূপ অনুষ্ঠানে কুন্‌বিরা যে ব্যয় করে সেটাই সাধারণতঃ বড় হয়ে চোখে পড়ে। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সাধারণ সঙ্গতির একজন কুন্‌বির ব্যয় ৫০৲ টাকা থেকে

৭৫৲ টাকার মধ্যেই থাকে। সুদের হার যদি শতকরা ২৪৲ টাকাও হত, তা হলেও এই টাকা শোধ করে দিতে কৃষককে খুব বেগ পেতে হত না—অবশ্য যদি তার লাভের ধন অপর পাওনাদারে না খেয়ে যায় এবং যদি সাউকার তার সঙ্গে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে লেনদেন করে। খাদ্য, অন্যান্য সামগ্রী, বীজ, বলদ, সরকারী খাজনা প্রভৃতির তাগিদে ছোট ছোট অঙ্কে ঋণের সামগ্রিক বোঝা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে যে-পরিমাণে বেড়ে চলে তার তুলনায় বিবাহ প্রভৃতির মত কালেভদ্রে দু'একটি অনুষ্ঠানের জন্য যে ঋণ হয় তা সামান্য।" (২০)

কমিশন এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। কৃষকদের ঋণভারের জন্য তাঁরা দায়ী করেছেন সমগ্র রাজস্ব-ব্যবস্থাকেই। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে,

"বছরের ফলনের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে যে-রাজস্বব্যবস্থা প্রতি বছর একই পরিমাণ টাকা চাষীদের কাছ থেকে আদায় করে থাকে তার ফলে ঋণ না হয়ে পারে না। খারাপ ফলনের বছর চাষী ধার করতে বাধ্য হবেই। এমন কি, ভাল ফলনের হারে খাজনা না ধরে, অনেক নীচু হারে খাজনা ধরলেও ধার হবে ; কেননা ভাল বছরে তার যা উদ্বৃত্ত হবে, চেষ্টা করলেও তা সে রাখতে পারবে না ; পাওনাদারেরা তাকে রাখতে দেবে না।" (২১)

---

(২০) ঐ, পৃঃ ২০।
(২১) ঐ, পৃঃ ২১।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মোপলা অভ্যুত্থান
১৮৩৬-১৮৯৬

সারা উনিশ শতক জুড়েই মোপলাদের অভ্যুত্থান ঘটে বারম্বার। এই অভ্যুত্থানের পৌনঃপুনিকতায় বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। এর্নাদ, ওয়াল্লুবনাদ আর উত্তর পোন্নান—এই তিনটি তালুকের জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল মোপলা কৃষক। আর এই তিনটি তালুকই ছিল বিদ্রোহের পীঠভূমি। সরকারী ভাষ্যে মোপলাদের বিদ্রোহকে চিত্রিত করা হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উগ্র হিংস্রতার "উন্মত্ত বিস্ফোরণ" হিসাবে। এই সাম্প্রদায়িকতার ধূম্রজাল সরিয়ে ফেললেই কিন্তু আসল সত্য বেরিয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার যে এই তিনটি অঞ্চলের চাষীদের সুবিপুল অংশই ছিল মোপলা—পুরাযুগের আরবীয়দের বংশধর বা ইস্‌লাম ধর্মান্তরিত মালয়ালি; ওদিকে কিন্তু এই তিনটি অঞ্চলের শতকরা ১০০ জন জেনাম বা জমিদারই ছিল হিন্দু—নাম্বুদ্রি, রাজা আর হিন্দুমন্দির।

যতদূর জানা যায়, মোপলাদের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে ১৮৩৬ সালে। পরবর্তী আঠারোটি বছরে অভ্যুত্থান ঘটে মোট বাইশ বার। ১৮৪৯ সালের অভ্যুত্থানে লড়াই চলে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত। পুলিস আর সৈন্যের বিরুদ্ধে এক তীব্র খণ্ডযুদ্ধে ৬৪ জন মোপলা শহীদ হন। ১৮৫১-৫২ সালে এখানে সেখানে আবার আগুন জ্বলে ওঠে।

এই সমস্ত অভ্যুত্থানের প্রচণ্ডতা এবং পৌনঃপুনিকতা সরকারকে রীতিমত বিচলিত করে তুলল। সদর আদালতের স্ট্রেঞ্জ সাহেবকে নিযুক্ত করা হল একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনার কাজে। সে সব দিনে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ এত সচরাচর ঘটত না।

একজন ইংরেজ রাজপুরুষ সাধারণত যে চোখে দেখে থাকেন, স্ট্রেঞ্জ সাহেবও ঠিক সেই চোখেই সমগ্র ব্যাপারটি দেখলেন। তিনি রিপোর্ট করলেন, মোপলারা স্বভাবতই দুর্বৃত্ত; এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামা তাদের অপরাধ-প্রবণতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়; দরকার হল, শক্ত হাতে তাদের দমন করা।

স্ট্রেঞ্জ-এর পরামর্শ অনুযায়ী অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল। ১৮৫৪ সালের ২৩নং এবং ২৪নং ভারত আইন পাশ করা হল। এর ফলে আরও বৃহৎ পুলিস বাহিনীর ব্যবস্থা হল; তাদের হাতে জরুরী ক্ষমতা দেওয়া হল; অন্যদিকে মোপলাদের ভোজালি রাখবার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। ১৮৫৪ সালে উক্ত এলাকার কালেক্টর মিঃ কনোলি মোপলাদের নিরস্ত্র করতে শুরু করল। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে এই ব্যক্তিটি কৃষকদের কাছ থেকে ৭৫৬১ খানা ভোজালি কেড়ে নিল। এই কাজ করতে গিয়ে বিরাট সংখ্যক কৃষককে গ্রেফতার করা হল এবং সাজা দেওয়া হল। (১)

মোপলারা নিরস্ত্র; তাদের নেতারা অন্ধকার কারাকক্ষে আটক; —বৃটিশ শাসকরা বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করল। কিন্তু মোপলা কৃষকরা সরকারের এই অত্যাচার, এই অবিচার ভুলে গেল না। জেনামি আর মহাজনদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা দূরে থাক, সরকার তাদেরই আবার সাজা দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। মোপলাদের ক্রোধের প্রধান লক্ষ্য হল কনোলি সাহেব;— নৃশংস অত্যাচারের সেই ছিল মূর্তিমান্ বিগ্রহ।

১৮৫৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর একদল মোপলা-কৃষক কনোলির বাড়ী আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। কিন্তু কাজ সমাধা করে ফিরবার পথে পুলিস ও সৈন্যবাহিনী তাদের বেকায়দায় ফেলে ঘিরে

(১) জেম্‌স্ বার্জেস, ক্রনলজি অব মডার্ণ ইণ্ডিয়া, ১৪৯৪-১৮৯৪।

ধরে। তারাও অমিত বিক্রমে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবস্থা তাদের প্রতিকূল, তবুও আত্মসমর্পণ তারা করবে না। যে সরকারকে তারা সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে, তারই পুলিস ও সৈন্যের কাছে হার মানা ?······না, না, কিছুতেই না।······সাতদিন একটানা সংগ্রামের পর পুলিস ও সৈন্যের দল এই কৃষকবীরদের "পরাভূত করে"। কিন্তু তখন আর একজন কৃষকও জীবিত ছিল না, যার কাছ থেকে তারা আনুগত্য আদায় করতে পারে।

১৮৫৯ সালে ২০নং ভারত আইন পাশ করা হয় ;—উদ্দেশ্য মোপলা কৃষকদের "ঠাণ্ডা করা"! সঙ্গে সঙ্গে দমন-পীড়নের নতুন নতুন ব্যবস্থাও করা হয়। এই সব ব্যবস্থার ফলে মোপলাদের প্রতিরোধ সংগ্রামে বিরতি ঘটে বটে—কিন্তু সে বিরতি নিতান্তই সাময়িক। কেম্‌ব্রিজ ইতিহাসও স্বীকার করেছে, দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই সব ব্যবস্থা "মোপলাদের সংগ্রাম দমনে ব্যর্থ" হয়েছে। (২)

১৮৬৮-৭৪ সালে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য দারুণভাবে পড়ে যায়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের আমলে যে তূলার মূল্য হয়েছিল আকাশ-ছোঁয়া, সেই তূলার মূল্যই পড়তে শুরু করল সব চাইতে আগে। তূলার পিছু পিছু অন্যান্য উৎপন্নের দামও দারুণভাবে নিম্নগামী হল। এই মন্দার ফলে মোপলা কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হল দারুণভাবে। এই অবস্থায় সরকারের উঁচুহারে খাজনার দাবি মেটানো কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। সরকার ছাড়াও আর এক রকমের দাবিদার তাদের দাবি নিয়ে উপস্থিত হল। তারা হল মহাজন। কৃষকের বিরুদ্ধে মামলার পর মামলা রুজু হল। আদালতের ডিক্রীর ফলে কৃষকদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত হয়ে মহাজনদের দখলে চলে যেতে থাকল।

---

(২) দি কেম্‌ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৮।

অপরদিকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত সর্বস্ব-বঞ্চিত মোপলা কৃষকদের মধ্যেও ব্যাপক বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে লাগল।

স্ট্রেঞ্জ-এর সুপারিশ অনুযায়ী সরকার যে দমনপীড়ন শুরু করল, তা কেবল এই বিক্ষোভের তুষানলে ইন্ধনই জোগালো। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৩ সালে এই ধিকি ধিকি বিক্ষোভ প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকারে জ্বলে উঠল। ১৮৮০ সালে আর একবার এই বিস্ফোরণ ফেটে পড়ল।

সরকারের দমনপীড়ন উপেক্ষা করে মোপলা কৃষকদের এই যে পৌনঃপুনিক বিদ্রোহ, এর ফলে সরকারের টনক নড়ল। সরকার মিঃ লোগানকে নিযুক্ত করল এই সব বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত করতে।

স্ট্রেঞ্জ-এর তদন্ত আর লোগান-এর তদন্তের মধ্যে প্রায় পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ১৮৬০ সালের নীলচাষীদের ধর্মঘট এবং ১৮৭৫ সালের মারাঠা কৃষকদের অভ্যুত্থান সংক্রান্ত তদন্তের ফলে কয়েকজন সিভিল সার্ভেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গীতেও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। বৃটিশ আমলের আগে মালাবারের কৃষকসমাজের অবস্থা কি রকম ছিল, বৃটিশ আমলে সে অবস্থায় কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, সে সব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট মিঃ লোগান দাখিল করেন। ই, এম্, এস, নাম্বুদ্রিপাদের মতে লোগানের এই রিপোর্ট এবং 'মালাবার ম্যানুয়াল'-এর প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদটি, "কৃষি-সমস্যার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি ঐতিহাসিক দলিল।" (৩) এই দুটি দলিলই মালাবারের প্রজাস্বত্ব সংস্কারের সমর্থকদের হাতে মৌলিক মালমশলা জুগিয়েছে।

স্ট্রেঞ্জ-এর রিপোর্ট আর লোগানের রিপোর্ট সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণীর। "মোপলাদের উন্মত্ততাকে" আক্রমণ না করে তিনি বৃটিশ আমলে মোপলা কৃষকদের উপর যে সব অবিচার করা হয়েছে সেদিকে

(৩) ই, এম্, এস্, নাম্বুদ্রিপাদ, দি পেজাণ্ট মুভমেণ্ট ইন কেরালা পৃঃ ২।

সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পরে তিনি তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে লেখেন, (৪)

[১] বৃটিশ আইনবিদ্‌গণ মালাবারের ভূমির স্বত্বাধিকার-ব্যবস্থা বুঝতে পারেন নি। বৃটিশ সামন্ত-ব্যবস্থা এবং একচ্ছত্র স্বত্বাধিকার তাঁরা মালাবারে আমদানি করেছেন। এইভাবে তাঁরা ভূসম্পত্তি সম্পর্কে এদেশীয় শব্দ ও সংজ্ঞাগুলিকে বিদেশীয় অর্থে মণ্ডিত করেছেন।

[২] মালাবারে জমির একচ্ছত্র স্বত্বাধিকার কোন কালেই ছিল না। রায়ত আর ক্ষেতমজুর—এই দু' শ্রেণীর চাষীর সঙ্গে জেনমি ছিল সহ-স্বত্বাধিকারী। মোট ফসলের এক-তৃতীয়াংশ সে পেত "জেনমি ভোগম্" হিসেবে। বৃটেনে খাজনা বলতে যা বোঝায় এই "জেনমি ভোগম্" তা নয়। এই "জেনমিভোগম্"-এর পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ থেকে বাড়াবার কিম্বা জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করার অধিকার তার ছিল না।

[৩] জেনমিরা জমির একচ্ছত্র মালিক, কৃষককে উচ্ছেদ করবার অধিকার তাদের আছে, যথেচ্ছভাবে খাজনা বাড়াতেও তারা পারে—এই মর্মে কোর্ট যে সব রায় দিয়েছে, সেই সব রায় আইনের ভুল ব্যাখ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

[৪] অধিকন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বৃহত্তম ভুলের পর্যায়ভুক্ত। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ফলে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, মোপলা-অভ্যুত্থানগুলি তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

উপরিলিখিত সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে তিনি সুপারিশ করেন যে, কৃষককে পুরানো অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তাকে তার পুরানো

(৪) ঐ, পৃঃ ৩-৪।

মর্যাদায় সংস্থাপিত করা হোক। অর্থাৎ স্থায়ী স্বত্বাধিকার, পূর্বতন হারে স্থিতিশীল খাজনা এবং যদি কখনও যথাবিহিতভাবে উচ্ছেদ করা হয় তবে জমির উন্নতিসাধনের দরুন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের অধিকার দেওয়া হোক।

স্ট্রেঞ্জ-এর স্থপারিশ কাজে পরিণত করতে যে-সরকারের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয়নি, সেই সরকারই কিন্তু লোগান-এর স্থপারিশ করার বেলায় টালবাহানা করতে লাগল। সরকারের হুঁস আনবার জন্য ১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত আরও পাঁচ পাঁচটা বিস্ফোরণের দরকার হল। অবশ্য এর পরেও সরকার ১৮৮৭ সালের ১নং আইন পাশ করার বেশি আর কিছু করল না। এই আইনের ফলে ভূমি থেকে উৎখাত কৃষকেরা সংশ্লিষ্ট ভূমির উন্নতিসাধনের দরুন কিছু ক্ষতিপূরণের অধিকার পেল। অবশ্য এই আইনের মধ্যেও অনেক ফাঁক ও ফাঁকি রাখা হয়েছিল; উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সামান্যতম নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়নি। অন্য-দিকে ঠিক এই সময়েই "চারটি তালুককে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হয়।" (৫)

১৮৯৪ সালে আরও একবার অভ্যুত্থান ঘটে। এবারকার অভ্যুত্থান রীতিমত গুরুতর আকার ধারণ করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লোগান-এর স্থপারিশগুলি কার্যকরী করতে সরকারের কোন আগ্রহ দেখা গেল না। বরং যাতে করে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সৈন্যবাহিনী ভাল করে টহল দিতে পারে তার জন্য বড় বড় সড়ক তৈরির ব্যবস্থা হল। মোপলা শিশুদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে অনেক গালভরা কথা শোনানো হল। বোধহয় আশা ছিল বৃদ্ধ আর যুবকদের তো সশরীরে খতম করে দেওয়া হয়েছে, এবারে তথাকথিত এক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করে শিশুদের মানসিক দিক থেকে ক্লীব ও পঙ্গু করে গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু সে আশাও দুরাশায় পরিণত হল।

(৫) দি কেম্‌ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া; খণ্ড ৪; পৃঃ ২৬৮।

১৮৯৬ সালে আর একবার মোপলারা বিদ্রোহের ময়দানে সামিল হয়। এবারকার বিদ্রোহে কৃষকদের ঘৃণা ও তিক্ততার চরম অভিব্যক্তি ঘটে।

কেম্‌ব্রিজ ইতিহাসে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে ঃ

"বিদ্রোহীরা একটি মন্দিরকে তাদের ঘাঁটি করল। এই মন্দিরটিই ১৮৪৯ সালে শহীদদের রক্তে পবিত্র হয়েছিল। সেই মন্দির থেকে যুদ্ধ করতে করতেই তারা মৃত্যুবরণ করল। আর এই মৃত্যুই ছিল তাদের উচিত শাস্তি। মন্দিরটিতে মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে উঠল ; রক্তের ধারা বয়ে গেল ; মোট ৯৯ জনের মধ্যে ৯৬ জনই নিহত হল।"

এর সঙ্গে কেমব্রিজ ইতিহাস আরও যা লিখেছে নির্লজ্জ মিথ্যাচারের এমন উৎকট দৃষ্টান্ত বিরল। "৯৯ জনের মধ্যে বাকী যে ৩ জন বেঁচে ছিল ; অভাব অভিযোগের কোন নজীরই তারা দিতে পারল না।" (৬)

১৮৩৬ সালের বিদ্রোহের যে আগুন মোপলা কৃষকদের মধ্যে জ্বলে ওঠে, উনবিংশ শতক পার হয়ে গেলেও কিন্তু আগুন নিবে গেল না। ১৯২১ সালে সেই আগুন আবার জ্বলে উঠল, ক্রমে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের দেশজোড়া দাবানলে তা লীন হয়ে গেল। অনির্বাণ অগ্নি-শিখার অমলিন আলোকে আদিগন্ত রক্তিম হয়ে উঠল।

(৬) ঐ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—উপসংহার—

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে যে সব কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছে তার কয়েকটির রূপরেখা আমরা এখানে দিলাম। কয়েকটি মাত্র অভ্যুত্থানের অতি সংক্ষিপ্ত এই বিবরণী থেকেই গুটিকয়েক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে।

(১) ভারতের কৃষকসমাজের ঐতিহ্য কত গৌরবময়, কত সংগ্রামশীল—এই সব ঘটনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারি। প্রত্যেকটি অভ্যুত্থানই ভারতীয় কৃষকসমাজের মূল দাবিগুলিকে সামনে এনে হাজির করেছেঃ জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ, মহাজনী অত্যাচারের বিলোপ। এইসব অভ্যুত্থান এই দাবিগুলিকে শুধু যে জীবন্ত করে তুলেছে তাই নয়; এই দাবিগুলি যে কৃষকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর, তা'ও প্রমাণ করে দিয়েছে। সুতরাং এই দাবি দুটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কৃষক সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটতে পারে না।

(২) প্রত্যেকটি সংগ্রামই কৃষকসমাজের চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ, আরও পরিণত করে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এই রক্তক্ষরা সংগ্রামের মাধ্যমেই কৃষকদের মনে এই উপলব্ধি এসেছে যে সরকারের সংগঠিত শক্তি তাদের প্রত্যক্ষ শত্রু জমিদার ও মহাজনের সমর্থনেই সদাসর্বদা সংহত ও প্রস্তুত থাকে। একদিকে কৃষকসমাজ আর অন্যদিকে জমিদার-মহাজন—এ দুয়ের সংঘর্ষে সরকার নিরপেক্ষ বিচারক নয়, সরকার জমিদার ও মহাজনেরই স্বপক্ষ শক্তি।

রাজনৈতিক দল প্রভৃতির জন্ম হবারও বহু আগে ভারতের কৃষকসমাজের এই যে মরণপণ সংগ্রাম এ থেকেই বোঝা যায় তাদের

অভাব-অভিযোগ কত বাস্তব, কত গভীর ; সঙ্গে সঙ্গে আরও বোঝা যায় তাদের সংগ্রামী সংকল্প কত দৃঢ়, কত অদম্য। এইসব ঘটনা থেকে আরও একটি তথ্য প্রমাণিত হয় ; তা এই যে, যারা প্রচার করে বেড়ায় ভারতের কৃষক আন্দোলন বিদেশী চরদের কারসাজি, তারা কত বিভ্রান্ত, কত মিথ্যাচারী। সাঁওতালদের, নীলচাষীদের, মারাঠাদের কিম্বা মোপলাদের এই সংগ্রাম কোন বিদেশী চরের কারসাজিতে হয়নি, হতে পারে না।

(৩) স্বতস্ফূর্ত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংগ্রামের সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও, কৃষকদের এইসব অভ্যুত্থানের ফলে যে সব সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার মূল্যও নেহাৎ কম নয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে সাঁওতাল পরগণাকে একটি আলাদা সংস্থা বলে স্বীকার করে নিতে হয় ; এইভাবে জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে তাদের দাবি ও মর্যাদার স্বীকৃতি তারা আদায় করে। যারা সাঁওতালদের মনে করত "অসভ্য অধিবাসী", মনে করত প্রতিবেশী বাঙ্গালী বা বিহারীদের সভ্যতার মধ্যে বিলীন না হলে সাঁওতালরা কখনও সভ্য পদবাচ্য হবে না, তারা যে কত ভ্রান্ত এ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

নীলচাষীদের ধর্মঘটের ফলে চাষীদের নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী বীজবপন করবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। পাবনা, বগুড়া ও বারাসত থেকে নীলকর সাহেবরা বিতাড়িত হল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে চম্পারনের নীলচাষীদের যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়, এইসব জেলার কৃষকদের তা আর পোহাতে হল না। চম্পারনের কৃষকরা যখন নীলশিল্পের ভগ্নাবশেষের তলায় পিষ্ট হচ্ছে, তার বহু আগেই পাবনা, বগুড়া ও বারাসতের চাষীরা নীলকর আর নীলচাষকে বিদায় করে দিয়েছে।

মারাঠা কৃষকদের অভ্যুত্থান সরকারকে বাধ্য করল অত্যধিক হারে সুদ আদায় এবং জমি বেদখলের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে। ১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্যে কৃষি-ত্রাণ আইন এই অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফল।

এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে কৃষকদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য। প্রতি ইঞ্চি জমি বুকের রক্তে রঞ্জিত করে কৃষক-বীরদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। তবেই তারা সক্ষম হয়েছিল সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে কিছু পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে ব্যাপক কৃষকসমাজের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে বৃটিশদের আস্থা টলিয়ে দিয়েছিল। বিরাট কৃষকসমাজের বিশাল বিক্ষোভের এই বলিষ্ঠ অঙ্গীকার হিউম সাহেবের চোখে ধরা পড়ল। তিনি বুঝলেন গণ-প্রতিরোধের এই আপাত-স্তিমিত ধারাগুলি যদি একটি বিপুল প্লাবনে রূপান্তরিত হয়, তা হলে বৃটিশ শাসনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। অতএব কিছু একটা দরকার—এবং এই কিছু একটা করাও হল; তা হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। হিউম সাহেবের কাগজপত্রের মধ্যে একটা স্মারকলিপি পাওয়া গেছে, তাতে তিনি লিখেছেন,

> "আমি নিশ্চিত…………এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের আসন্ন বিপদের মুখে আমরা দাঁড়িয়েছি। ত্রিশ হাজার সংবাদদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত, জিলা-উপজিলা-মহকুমা-নগর-শহর-গ্রাম হিসাবে বিন্যস্ত সহস্র সহস্র বিবরণীর সাত সাতটি অতিকায় ফাইল আমি দেখেছি। এসব থেকে দেখা যায়, দরিদ্র মানুষ বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছে; তাদের নিশ্চিত ধারণা,

তিল তিল অনশনে তাদেরকে মারা যেতে হবে ; সুতরাং **কিছু** তাদের করতেই হবে। এই **কিছু** করবার পথেই তারা অগ্রসর হচ্ছে, **আর এই কিছু করা মানেই হ'ল হিংসার আশ্রয় নেওয়া**।······প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছোট ছোট দল মিলে যাবে বড় বড় বাহিনীতে—পাতার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর মত।········· যখন এই বাহিনীগুলি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে তখন সরকারের বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে—এবং সম্ভবত অযৌক্তিকভাবে —বিক্ষুব্ধ কিছু শিক্ষিত লোক আন্দোলনে যোগ দেবে, এই খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভকে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং এইগুলিকে জাতীয় বিদ্রোহ হিসাবে পরিচালিত করবে।"

(এ, ও, হিউম : ফাদার অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস : পৃঃ ৮০-১)

জনগণের এই ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভে, বিদ্রোহী কৃষকদের মরণপণ সংগ্রামে সন্ত্রস্ত হয়ে হিউম সাহেব ছুটলেন ভারতের বড়লাট ডাফরিনের দরবারে—হাতে তাঁর জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি করবার পরিকল্পনা। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে বিক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনতে হবে কংগ্রেসের চৌহদ্দির মধ্যে যাতে করে কংগ্রেস গড়ে উঠতে পারে সরকারের অনুগত বিরোধী দল হিসাবে। কৃষকসমাজের অভ্যুত্থান আর বুদ্ধিজীবী সমাজের আলোড়ন—এই দ্বিবেণী স্রোতধারা যদি একটি উত্তাল প্লাবনে রূপ লাভ করে তা'হলে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যই ভেসে যাবে—এই আশঙ্কার ফলেই হিউম সাহেবের এই প্রয়াস। সংগ্রামী কৃষকদের দিয়ে নয়, নম্র-ভদ্র বুদ্ধিজীবীদের নিয়েই এইভাবে মহা আড়ম্বরে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল। এই কংগ্রেসই অবশ্য কালক্রমে জনগণের মুখপাত্র এবং সংগ্রামী সংগঠন হিসাবে রূপান্তর লাভ করে। কৃষক বিদ্রোহের তরঙ্গ-বিক্ষোভেই কংগ্রেসের উদ্ভব ও রূপান্তর— কৃষকসমাজের কাছে এই ঘটনা কম গৌরবের নয়। ১৯১৪ সালের

যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের সীমাবদ্ধ প্রাঙ্গণে কৃষকসমাজের ঠাঁই ছিল না; তাই ১৯১৮-১৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল প্রধানত বক্তৃতাবাগীশদের সংগঠন।

(৪) যদিও কৃষকদের এসব বিদ্রোহ ছিল স্বতস্ফূর্ত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তবুও এগুলির মধ্য দিয়ে সংগ্রামের যে সব নতুন নতুন ধরন ও কায়দার উদ্ভব ঘটল, সেগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য খুবই গভীর। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের দিকে তাকান, তাকান ১৮৬০ সালের নীলচাষীদের বিশাল ধর্মঘটের দিকে, তাকান ১৮৭৫ সালের মারাঠা কৃষকদের হাতে নথিপত্র আর দলিলদস্তাবেজের বহ্ন্যুৎসবের দিকে—দেখবেন আজও পর্যন্ত ভারতের কৃষকসমাজ সেই সেদিনকার বিভিন্ন সংগ্রাম-পদ্ধতিরই আশ্রয় গ্রহণ করছে।

(৫) বিদ্রোহ যখন এগিয়ে চলেছে, তখন কিছু পরিকল্পনা, কিছু সংগঠনের পরিচয় আমরা পেয়েছি; কিন্তু মোটের উপর এই সব বিদ্রোহ ছিল স্বতস্ফূর্ত—অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বতস্ফূর্ত সংগ্রাম। দুর্ভিক্ষ, মূল্যহ্রাস, মাত্রাহীন নির্যাতন—এই জাতীয় কোন প্রত্যক্ষ কারণের জন্য দুর্দশা যখন চরমে উঠেছে, তখনই তারা অমিত বিক্রমে বিদ্রোহের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিরোধে সামিল হয়েছে। অবশ্য বিপুলায়তন প্রতিকূল শক্তির সুসজ্জিত সমাবেশের মুখে তারা বেশিদিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি! শত্রুপক্ষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে কৃষকদের ক্ষমতা ছিল তখন সীমাবদ্ধ; সংগঠন সংহত ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারেও তাদের সামর্থ্য ছিল সীমায়িত। স্বভাবতই তাদের সংগ্রামের চরিত্র ছিল স্বতস্ফূর্ত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ক্রমবর্ধমান কৃষক সংগ্রামকে ক্রমপ্রসারণশীল সংগঠনের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে তারা

পারেনি আর সেজন্যেই তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ রূপায়ণের উপযোগী পরিপ্রেক্ষিতও তারা তৈরি করতে পারেনি।

যাই হোক ভবিষ্যৎ ভারতে সফল সংগ্রামের পথে এই বিদ্রোহগুলির অবদান বড় কম নয়। সংগ্রামী ভবিষ্যতের পথে এগুলি সার্থক মহড়া।

পরিশিষ্ট

মহীশূরে কৃষক অভ্যুত্থান

জেম্‌স্ বার্জেস্-এর 'ক্রনলজি অব মডার্ণ ইণ্ডিয়া: ১৪৯৪-১৮৪৯' নামক বইয়ে মহীশূরের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, তা থেকে বোঝা যায় যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সব কৃষক-বিদ্রোহ বিপুল সাফল্য অর্জন করে, এটি সেগুলির অন্যতম।

১৮৩০ সালের প্রথম দিকে মহীশূরের "নগর" বিভাগে কৃষকেরা "এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সামিল হয় এবং সদর মল্ল অর্থাৎ কৃষকরাজ স্থাপন করে।" মহীশূর ঘোড়সওয়ার বাহিনী এবং লেফটেনাণ্ট রচফোর্ডের নায়কত্বে একদল পদাতিক সৈন্য ৩রা মার্চ উক্ত জেলায় প্রবেশ করে, বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য। এরা কামান-দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করে। হোনালিতে একটি খণ্ডযুদ্ধের পরে সৈন্য-বাহিনী চন্দ্রগুটি এবং বেদনুর নামে আরও দুটি জায়গা বিদ্রোহীদের হাত থেকে কেড়ে নেয়। এ শহর ক'টি হাতছাড়া হওয়া সত্ত্বেও কৃষকেরা সমগ্র গ্রামাঞ্চল আগলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৩০ সালে সারা বছর জুড়েই কৃষক আর সৈন্যের মধ্যে এখানে সেখানে সংঘর্ষ চলতে থাকে।

১৮৩১ সালে ফতপাতে ইভান্সের অধিনায়কত্বে পরিচালিত সৈন্যবাহিনীকে কৃষকেরা পরাভূত করে। সিমোগাতে নতুন করে সৈন্য সমাবেশের পরে ইভান্স "নগর"-এর দিকে আবার অভিযান চালায় এবং ১২ই জুন চূড়ান্ত ভাবে "নগর" অধিকার করে। এই বিদ্রোহের ফলাফল বার্জেস এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

"একাধিক আপসমূলক ঘোষণা জারি করা হয়; রায়তদের অনেক অভাব-অভিযোগ প্রতিকার করা হয়। ৩রা অক্টোবর মহীশূরের

রাজা কৃষ্ণ উদয়ারকে সমস্ত ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করা হয়। তাঁর জায়গায় চারজন সুপারিণ্টেডেণ্ট সহ একজন কমিশনারের উপর রাজ্যের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়।"

—শেষ—